গল্প ও কবিতা ও কমিক্স ◆ মনের কথা কই ◆ কেরিয়ার গাইড

নভেম্বর ২০০২ দশ টাকা

কিশোর ভারতী

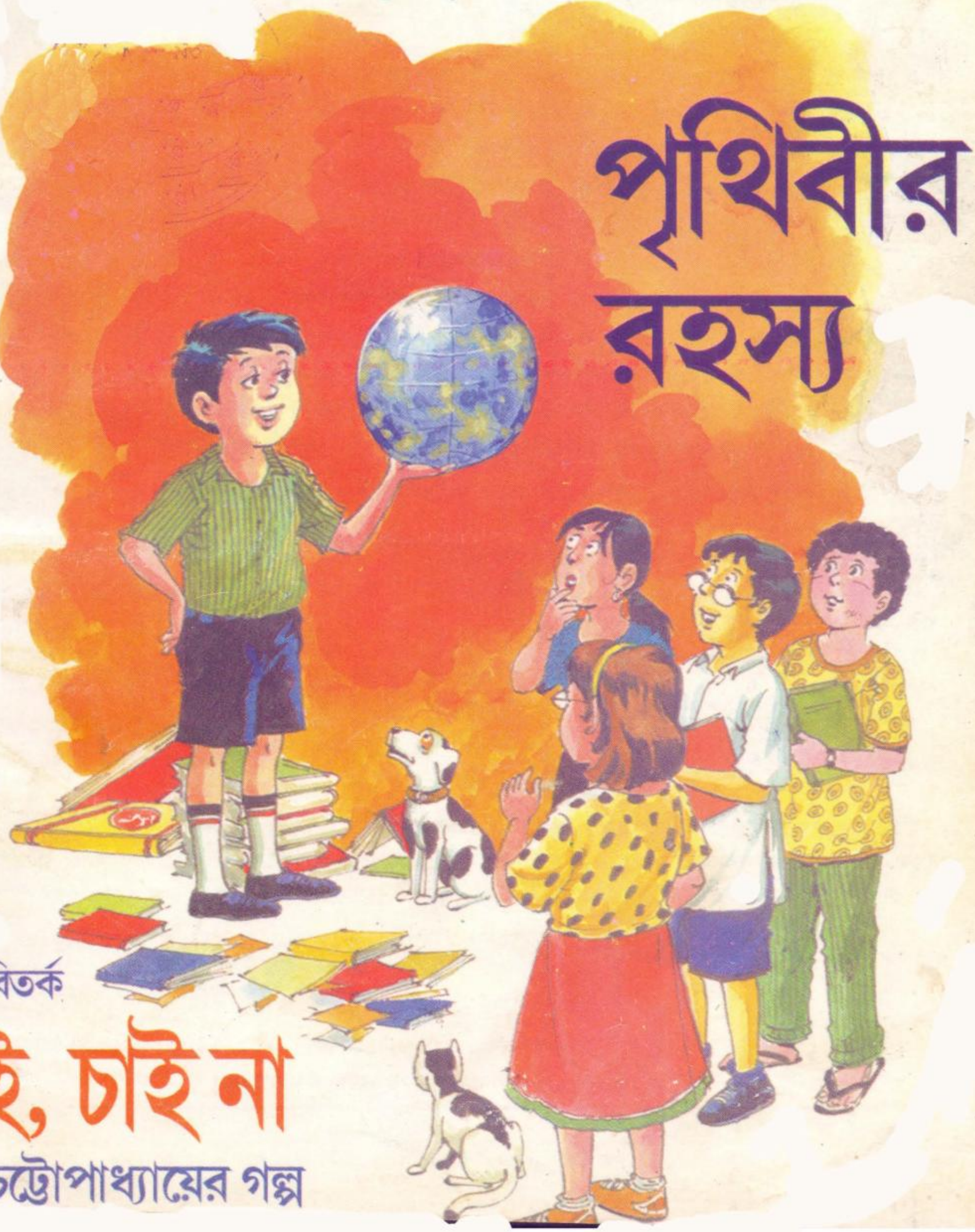

পৃথিবীর রহস্য

নতুন বিতর্ক

চাই, চাই না

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের গল্প

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান : পার্থ ভট্টাচার্য

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

পুনর্মুদ্রণ নয়, আবিষ্কার! ৮৪ বছর পরে

একত্রে ১৩২৫ ও ১৩২৭

নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় *সম্পাদিত*

বাংলাভাষার প্রথম বার্ষিকী

পার্বণী

১০০.০০

নবরূপায়ণ

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন

"...আমি ইহার বৈচিত্র্য, সৌষ্ঠব ও সরসতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি—অথচ ইহার মধ্যে পাঠকদের জানিবার ভাবিবার বুঝিবার কথাও অনেক আছে। তোমার এই সংগ্রহটি কেবলমাত্র ছুটির সময় পড়িয়া তাহার পরে পাতা ছিঁড়িয়া, ছবি কাটিয়া কালি ও ধূলার ছাপ মারিয়া জঞ্জালের সামিল করিবার সামগ্রী নহে—ইহা আমাদের শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডারে নিত্য ব্যবহারের জন্যই রাখা হইবে।..."

দুষ্প্রাপ্য দুই বছরের বার্ষিকী একত্রে পুনর্প্রকাশের পর

পত্রপত্রিকা উচ্ছ্বসিত

"...পত্র ভারতী থেকে ঘটেছে এই মেদুর প্রকাশন।... ১৩২৫ ও ১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত দু'খণ্ডের যে পার্বণীটি ১৪০৯ বঙ্গাব্দের পুজোয় বাঙালির হাতে পার্থজিৎ তুলে দিলেন সে এক আশ্চর্য বই। চুরাশি বছর আগে বাঙালির মন প্রাণ কল্পনা ভাষা, সবই যেন আলাদা ছিল!..." **আনন্দবাজার পত্রিকা**

"...পার্বণী হারিয়েই গিয়েছিল বলা চলে। পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় অনেক পরিশ্রম করে তা তোমাদের জন্য উদ্ধার করেছেন।... আশা করবো বড়রা এই বইটি তোমাদের কিনে দেবেন—নয়তো জোগাড় করে অবশ্যই পড়বে। এই যে আমাদের এত গর্ব করার মতো অতীত, এ কে যে না জানলেই নয়।..." **গণশক্তি**

"...মহামূল্যবান, শিশুসাহিত্য-ভাণ্ডারের পরম সম্পদ সেই পার্বণী বহু পরিশ্রমে উদ্ধার করেছেন একালের বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক-গবেষক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।... কে লেখেননি এই পার্বণীতে!... পার্বণীর পুনরুদ্ধার ও উপযুক্ত সম্পাদনায় পুনর্মুদ্রণের এই প্রয়াস বাংলা শিশুসাহিত্যে এক স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। একালের ছোটরাও পার্বণী হাতে পেয়ে আনন্দ পাবে।..." **আজকাল**

রঙিন দুর্লভ আর্টপ্লেট □ লেখক ফোটো-অ্যালবাম □ লেখক-পরিচিত

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ **ফোন** ২৪১ ১১৭৫/৩৫০ ১৯৪৪

ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২ *e-mail* : **patrabha@vsnl.net**

কিশোর ভারতী ৩৫ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা □ কার্তিক ১৪০৯ □ নভেম্বর ২০০২

সবুজ এই গ্রহ আমাদের জননী। সৌরজগতের এই একমাত্র গ্রহেই আজ পর্যন্ত মিলেছে প্রাণের সন্ধান। সভ্যতার সেই ঊষাকাল থেকে মানুষ খুঁজে চলেছে পৃথিবীকে, তার ভিতর-বাহিরের দুর্জ্ঞেয় রহস্যকে জানতে উন্মুখ হয়েছে।... যত দিন গেছে, তত স্পষ্ট হয়েছে পৃথিবীর রহস্য। তারই এক রূপরেখায় এবারের প্রচ্ছদ কাহিনী

পৃথিবীর রহস্য ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭

গল্প

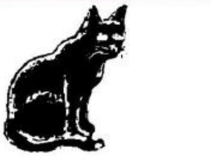

ফেলুমামার বেড়াল
পার্থ চট্টোপাধ্যায় ১৫

জন্মান্তর
দেবাঞ্জন চক্রবর্তী ১৯

একটি কদলী কাণ্ড
শৈবাল চক্রবর্তী ২৪

গল্প

সুখী মানুষের জামা
জ্যোতির্ময় মল্লিক ৩০

ঝড়ের রাতে নদীর ধারে
ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী ৩৪

তেলুগু বেড়াল
অভিজিৎ সেনগুপ্ত ৩৭

নিয়মিত আসর

আমাদের কথা ৩
তোমাদের কথা ৬
বিতর্ক ৪২
হাসিঠাট্টা ৪৯
এবার তুমি করবে কী? ৫০
মনের কথা কই ৫২
তোমাদের দপ্তর ৫৪
বিজ্ঞান দেশে দেশে ৫৫
বইয়ের দুনিয়া ৬৪

কমিক্স

নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ ৪
আরব্য রজনীর গল্প
অমর মজুমদার ২২
ছোটকু ও সুপার কম্পিউটার
সুদীপ্ত মণ্ডল ৩২
বগলা অ্যান্ড কোং
জুরান নাথ ৪০

ছড়া কবিতা

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ২৮
সুখেন্দু মজুমদার ২৮
পার্থপ্রতিম আচার্য ২৮
রূপক চট্টরাজ ২৮
তরুণকান্তি বারিক ২৯
সুনীতি মুখোপাধ্যায় ২৯
মৃণালকান্তি দাশ ২৯
আনসার উল হক ২৯

খেলা

খেলাধূলা করে যে...
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০

বাংলা শিখতে হলে

বাংলা ভাষার পাঠশালা
প্রসন্ন গুরুমশাই ৪৪

যাঁদের ভুলতে চাই না

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
শ্যামল চক্রবর্তী ৪৫

* অনিবার্য কারণে 'রাতের পদ্মায়' এই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়নি।

এটাই ঘটনা	ঠিক জবাবে ইনাম পাবে	ছড়াগড়া
দূরালাপ	গল্লাণু / সইসাবুদ	গালগপ্পো
বকবকানি	বন্ধু চাই	শব্দ হেঁয়ালি
ঠিকঠিকানা	কথার কচকচি	চাপান উতোর
হেঁয়ালি / মজারু	নিজে করো	বাতেলা

পরিচালক শুভাশিস ঘোষ ছবি জুরান নাথ ৫৬

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক **দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়**
সম্পাদক **ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়**
সহ-সম্পাদক **তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**
উপদেষ্টা **অনীশ দেব** ॥ **তপনকুমার দাস** ॥ **শ্যামল চক্রবর্তী**
মুখ্য সচিব **মানস চক্রবর্তী**
কার্যালয় সচিব **অনিমেষ পাল** ॥ **শুভাশিস লাহিড়ী** ॥ **শাশ্বত সেন**
কম্পিউটার গ্রাফিক্স **বরুণ রায়**
প্রচ্ছদশিল্পী **ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য**
কর্মাধ্যক্ষ **চুমকি চট্টোপাধ্যায়**
প্রধান কার্যালয় **১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি ৯ ফোন ৩৫০ ১৯৪৪**
বিক্রয় ও যোগাযোগ
পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২
E-mail : patrabha@vsnl.net

১০.০০

পত্র ভারতীর পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলি ৯ থেকে মুদ্রিত।

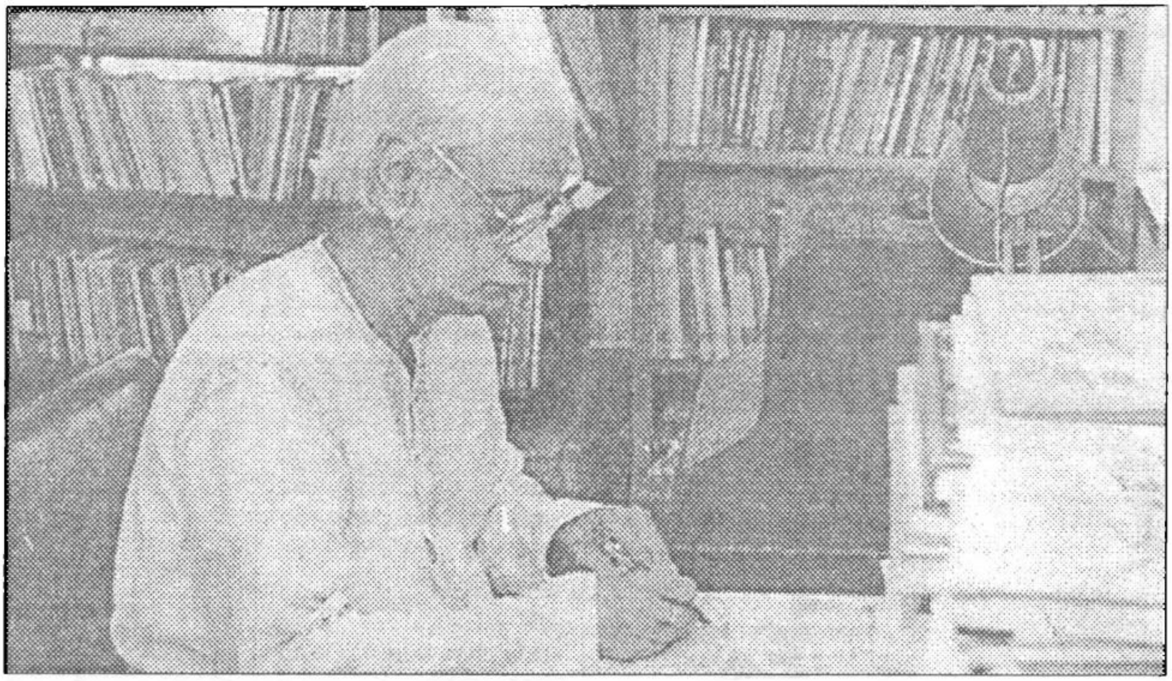

জন্ম ১৯০৪ প্রয়াণ ২০০২

আজ ২৯শে অক্টোবর। দাঁড়িয়ে আছি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সামনের প্রাঙ্গণে। আমাদের সামনে শায়িত রয়েছেন এমন একজন মানুষ, যাঁকে দেখলেই বুকের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে—

তেলের শিশি ভাঙল বলে খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভারত ভেঙে ভাগ করো...

বোধহয় সারা জীবনে এই একটিমাত্র পদ্য লিখেই কালজয়ী হওয়া যায়। দেশভাগের যন্ত্রণা, বাঙালির অনুভূতি কী অসম্ভব তীব্রতায় ঝলসে উঠেছে কলমে।

অন্নদাশঙ্কর রায় চলে গেলেন।...

২৮শে অক্টোবর ২০০২, শতবর্ষ ছুঁতে আর মাত্র কয়েকমাস বাকি, বিকেল ৩-৫০ মিনিটে পৃথিবীতে শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন অন্নদাশঙ্কর। 'পৃথিবীতে' বললাম এই কারণে অন্নদাশঙ্কর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যাঁর নিঃশ্বাস ছড়িয়ে আছে উত্তর প্রজন্মের প্রায় সব বাঙালির নিঃশাস-প্রশ্বাসে, অস্থিমজ্জায়, চিন্তাচেতনায়। উনবিংশ শতাব্দীর রেঁনেসাসের শেষ উত্তরসূরি যেন আমাদের অসহায় করে দিলেন। আমরা অভিভাবকহীন হয়েছি কালকেই।

এক বর্ণময়, বহুধাবিস্তৃত কীর্তি ছড়িয়ে আছে অন্নদাশঙ্করের শতাব্দীব্যাপী পথপরিক্রমায়। ১৯২৭-এ শুরু 'বিচিত্রা'য় ধারাবাহিক প্রকাশিত এক অনন্য ভ্রমণ-উপাখ্যান 'পথে-প্রবাসে', শেষ করেছেন মোট ১৬৫ বই দিয়ে। তার মধ্যে উপন্যাস ২২, ছোটগল্প সংকলন ১২, ছড়া-কবিতা বই ২৩, প্রবন্ধ-নিবন্ধ ৬৩...সুবিশাল দীর্ঘ তালিকা। গদ্য-পদ্য সর্বত্রই অলোকসামান্য দ্যুতি। আর বিবেক? স্বচ্ছ, স্পষ্ট, কোনও দ্বিধা নেই। সত্যিকে সত্যি বলতে একমুহূর্ত তাঁর কলম কাঁপেনি।

ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে তার তত ঘনিষ্ঠতা ছিল না। শতাব্দীপ্রাচীন মহীরূহের সামনে দাঁড়ালে লতাগুল্মের যে অনুভূতি হওয়া স্বাভাবিক, তা-ই হতো। কিন্তু দেখা হলেই হীরের মতো একজোড়া চোখে অফুরন্ত স্নেহ ছড়িয়ে বলতেন—'পত্রিকা ভালো হচ্ছে'। বাবার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল দীর্ঘকালের।

কিশোর ভারতীর প্রতি ভালবাসায় কখনও ছেদ পড়ে নি। যখন চেয়েছি, অকৃপণভাবে তাঁর লেখা পেয়েছি। এই ৩৫ বছর ধরে।

অন্নদাশঙ্কর রায়-এর মতো মানুষকে যেটুকু দেখেছি কাছ থেকে, নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে। এমন মানুষ কি আর পাব?

সম্পাদক

উৎসবের শেষে

প্রিয় বন্ধু,

পুজো, পুজো, পুজো! প্রতিবছরের ব্যাকুল প্রতীক্ষা। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্যে সবকিছু ভুলে থাকার মরিয়া চেষ্টা। সেই উৎসব এল, আলোয়-গানে-খুশিতে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য হিন্দু বাঙালি-বহুল রাজ্যকে মাতিয়ে চলেও গেল। সামনেই কালীপুজো, দীপাবলি, ভাইফোঁটা—পরপর। দেখতে-দেখতে ফুরিয়ে যাবে।

আবার যে-কে-সেই। সেই দৈনন্দিন যন্ত্রণা—বেকারি, দারিদ্র্য, অশিক্ষা-হতাশায় ডুবে যাওয়া। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকব কাগজের পাতায়—জঙ্গী উগ্রপন্থী হানা, দুর্ঘটনা, জাতপাত-সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কোথাও-না-কোথাও।

এভাবেই চলছে। কিছুসংখ্যক মানুষ চূড়ান্ত আরামে-বিলাসে ডুবে আছে, বেশিরভাগ মানুষই কোনও-না-কোনও যন্ত্রণার শিকার।

তবুও শারদ উৎসব আমাদের কাছে টাটকা অক্সিজেন, ধর্মীয় কোনও গণ্ডিতে আর আটকে রাখা যায় না এই কটা দিনকে।

তোমরা কেউ-কেউ হয়তো বেড়াতেও গেছিলে ছুটির মধ্যে। দূরে বা কাছে। যারা যাও নি, মণ্ডপে-মণ্ডপে ঘুরেছো বন্ধুদের নিয়ে বা নির্ভেজাল আড্ডা-গপ্পে কাটিয়ে দিয়েছো।

এই প্রসঙ্গে একটা কথাও উল্লেখ করতে হয়। পুজোর আগে-আগেই যেভাবে দেশের চতুর্দিকে দুর্ঘটনা-সন্ত্রাস ঘটে চলেছিল, মনের মধ্যে আশঙ্কার কালো মেঘ জড়ো হচ্ছিল। আমাদের রাজ্যে পুজোর দিনগুলো ভালোয়-ভালোয় কাটবে তো?

নাঃ, এখন অন্তত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলতে পারি, কিছুই হয়নি। পুরোপুরি শান্তিতে কেটেছে দিনগুলো। এই কলকাতা মহানগরীতে আমরা দেখেছি, প্রতিদিন জনবিস্ফোরণ ঘটেছে সন্ধে নামতেই। অত্যন্ত দক্ষতা, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের সঙ্গে মানুষের সুরক্ষা সামাল দিয়েছেন পুলিশ-প্রশাসন। লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিশ্চিন্তে সারারাত ধরে শারদ-উৎসব উপভোগ করেছেন, তাঁদের সঙ্গী হয়েছেন মহানগরীর হাজার-হাজার পুলিশ। বিনিদ্র রাত কাটিয়েছেন তাঁরাও। প্রশাসনের শীর্ষে থাকা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং তাঁর সহকর্মী মন্ত্রীদের অনেকেই ছিলেন কলকাতায়, ব্যবস্থাপনা তদারকি করে গেছেন নিঃশব্দে।

এঁদের সকলেরই অকুণ্ঠ অভিনন্দন প্রাপ্য।

গত কয়েকবছর ধরে শারদ-উৎসবে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, লক্ষণীয়ভাবে বদলে যাচ্ছে উৎসবের চেহারা-চরিত্র। বিভিন্ন বড়-বড় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছেন 'শ্রেষ্ঠ পুজো'র স্বীকৃতির নানা আকর্ষণীয় পুরস্কার বা সম্মান নিয়ে। আর তার ফলে বৈচিত্র্য এসেছে। পুজোমণ্ডপে এবং প্রতিমায়। কোথাও রাজস্থানের স্থাপত্য, কোথাও দাক্ষিণাত্যের মন্দির কোথাও আবার সুপ্রাচীন মেসোপটেমিয়ার ভাস্কর্য। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উঠে আসা এইসব প্রাচীন শিল্পের পাশাপাশি থাকছে আমাদের চিরায়ত সাহিত্যের চরিত্র বা চলচ্চিত্রের পটভূমিও। এছাড়া অনেক জায়গায় আবার মণ্ডপ ও প্রতিমা তৈরি হয়েছে ফেলে-দেওয়া ব্যবহৃত-অপ্রয়োজনীয় জিনিস দিয়েও। সেগুলিও ভারি চমৎকার, তাক লাগিয়ে দেয়।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, এই বঙ্গের প্রধান শারদ-উৎসব দুর্গাপুজোয় প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের এক স্বাস্থ্যকর প্রচেষ্টা ও প্রতিযোগিতা। নির্দ্বিধায় বলা যায়, শুভ উদ্যোগ।

আবার দেশের বর্তমান সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করলে মাঝে-মাঝে মনে হয়, এই শারদ-উৎসবে যে কোটি-কোটি টাকা খরচ হয় মণ্ডপ-আলোকসজ্জা এবং প্রতিমায়, তার একটা বড় অংশ যদি লগ্নি করা যায় নতুন শিল্পস্থাপনে, আমাদের কত ছেলে কাজ পেত!

রোজকার জীবন-যন্ত্রণার মাঝে ওই কটা দিনের আলোর রোশনাই যেমন দরকার মানসিক আনন্দের জন্যে, তেমনি অবিলম্বে দরকার আরও-আরও শিল্প-কলকারখানা-নতুন প্রযুক্তি। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য আনা যায় কি?

যাই হোক, শারদ-উৎসব উপলক্ষে তোমাদের সকলকে জানাই শুভ বিজয়া ও দীপাবলির অকুণ্ঠ ভালবাসা ও শুভেচ্ছা। আর কদিন পরেই খুলে যাবে তোমাদের স্কুল-কলেজ। তারপর হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষা, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট। আবার বইখাতা খুলে বসতেই হবে, অজস্র অক্ষর ঢুকিয়ে নিতে হবে তোমাদের মগজের কোষে-কোষে। সুতরাং আজ এখানেই থামছি। ভালো থেকো সব্বাই। ইতি—

তোমাদের
সম্পাদক-বন্ধু

আমাদের রোজকার যন্ত্রণার মাঝে ওই কটা দিনের আলোর রোশনাই যেমন দরকার মানসিক আনন্দের জন্যে, তেমনি অবিলম্বে দরকার আরও-আরও শিল্প-কলকারখানা-নতুন প্রযুক্তি। এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এবং ভারসাম্য আনা যায় কি?

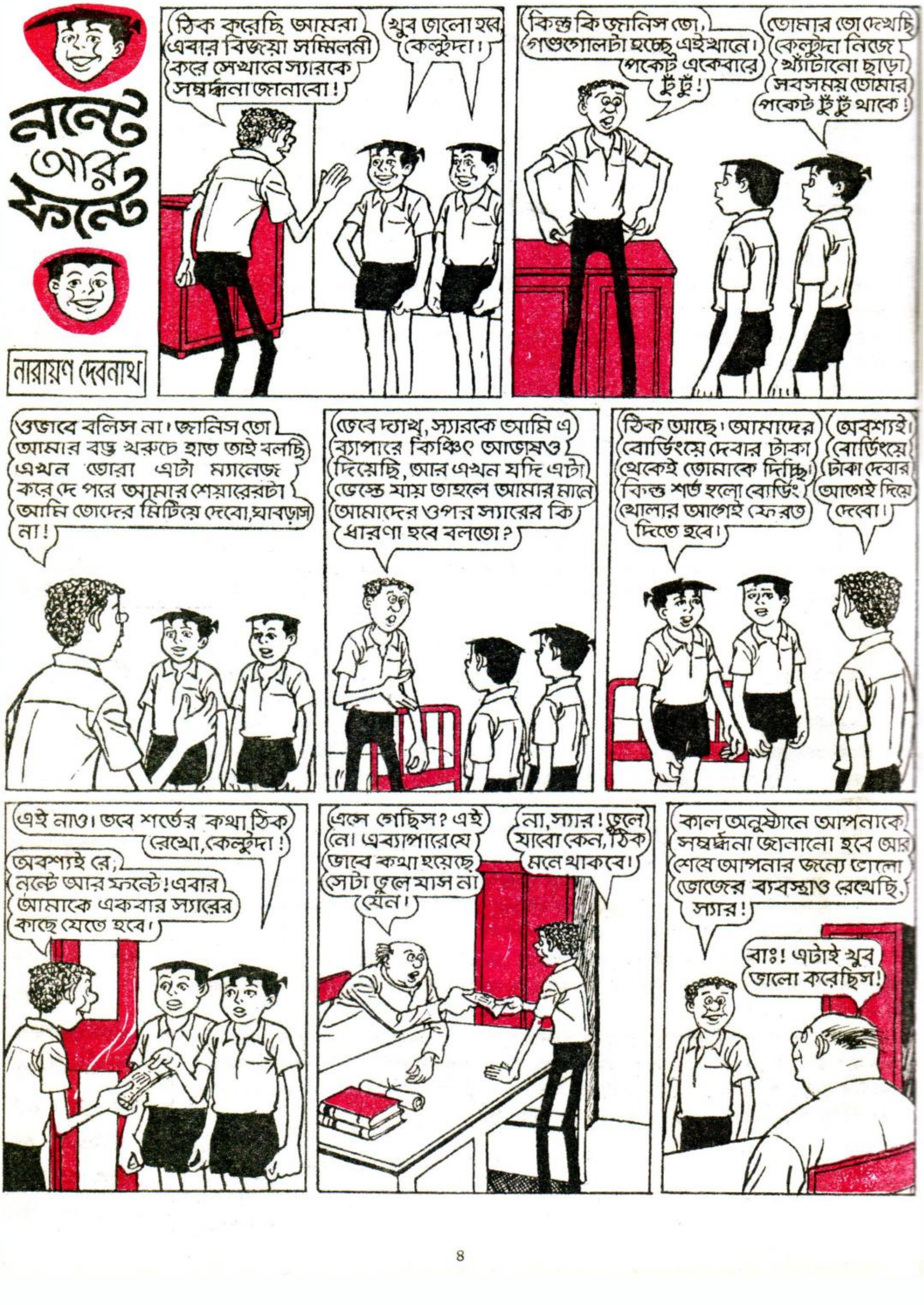
নন্টে আর ফন্টে
নারায়ণ দেবনাথ
ঠিক করেছি আমরা এবার বিজয়া সম্মিলনী করে সেখানে স্যারকে সম্বর্দ্ধনা জানাবো!
খুব ভালো হবে কেল্টুদা।
কিন্তু কি জানিস তো, গণ্ডগোলটা হচ্ছে এইখানে। পকেট একেবারে টুঁ টুঁ!
তোমার তো দেখছি কেল্টুদা নিজে খ্যাঁটানো ছাড়া সবসময় তোমার পকেট টুঁ টুঁ থাকে!
ওভাবে বলিস না। জানিস তো আমার বড্ড খরুচে হাত তাই বলছি এখন তোরা এটা ম্যানেজ করে দে পরে আমার শেয়ারেরটা আমি তোদের মিটিয়ে দেবো, ঘাবড়াস না!
ভেবে দ্যাখ্, স্যারকে আমি এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ আভাষও দিয়েছি, আর এখন যদি এটা ভেস্তে যায় তাহলে আমার মানে আমাদের ওপর স্যারের কি ধারণা হবে বলতো?
ঠিক আছে। আমাদের বোর্ডিংয়ে দেবার টাকা থেকেই তোমাকে দিচ্ছি। কিন্তু শর্ত হলো বোর্ডিং খোলার আগেই ফেরত দিতে হবে।
অবশ্যই। বোর্ডিংয়ে টাকা দেবার আগেই দিয়ে দেবো।
এই নাও। তবে শর্তের কথা ঠিক রেখো, কেল্টুদা!
অবশ্যই রে, নন্টে আর ফন্টে! এবার আমাকে একবার স্যারের কাছে যেতে হবে।
এসে গেছিস? এই নে। এব্যাপারে যে ভাবে কথা হয়েছে সেটা ভুলে যাস না যেন।
না, স্যার! ভুলে যাবো কেন, ঠিক মনে থাকবে।
কাল অনুষ্ঠানে আপনাকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হবে আর শেষে আপনার জন্যে ভালো ভোজের ব্যবস্থাও রেখেছি, স্যার!
বাঃ! এটাই খুব ভালো করেছিস!

পরদিন বিকেলে-
বন্ধুগণ! এবারে আমাদের বিজয়া সম্মেলন শুরু হচ্ছে। প্রথমেই স্যারকে মাল্যভূষিত করছি।
এবার উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করবে হোঁদলকুমার।
নমস্কার!
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো, আমার এই শীর্ণ দেহে শক্তি ভরো...
হাঃহাঃ! হিঃহিঃ! কে তোমাকে তুলবে? তুমি নিজেই নিজেকে তুলে নিয়ে কেটে পড়ো!
দেখলে তো কেল্টুদা? কতো আবেগ দিয়ে গানটা শুরু করেছিলাম কিন্তু হতচ্ছাড়ারা গাইতে দিলো না!
ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো আছি!
উপস্থিত বন্ধুগণ! স্যারকে সম্বর্দ্ধনা দেবার আগে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আজ আমাদের পুরোনো যা কিছু লেন দেন ভুলে গিয়ে আবার নতুন করে ভাবতে হবে!
সেকি গো, কেল্টুদা!
শুনুন, স্যার! কেল্টুদা আমার আর নন্টের কাছ থেকে এই অনুষ্ঠানের জন্যে টাকা ধার নিয়েছে। আমরা বোর্ডিংয়ে দেবার টাকাও কেল্টুদাকে দিয়েছি। এখন ও বলছে সব ভুলে যেতে!
সেকি!
মিথ্যে অল্প কথা বলে তো ও আমার থেকেও টাকা নিয়েছে চিটিংবাজটা! আমার টাকায় আমাকেই সম্বর্দ্ধনা! আবার বলছে সবকিছু ভুলে যেতে! নেংটি, মর্কট কোথাকার!
ইয়ে, স্যার! না, স্যার!
ভুলে যাবি? এটার একটা ঘা পড়লেই সব মনে পড়ে যাবে রে, ছুঁচো!
কেল্টুদাই রইলো না আমারও আর গান গাওয়া হবে না।
রাখো তোমার গান। এখন ঐ স্বর্গীয় দৃশ্য অবলোকন করো।

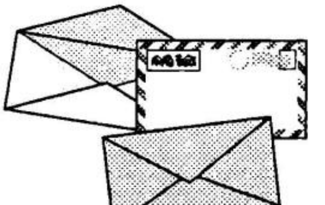

তোমাদের কথা

অভিষেক দেবনাথ *নবদ্বীপ, নদীয়া*

এবারের শারদীয়া কিশোর ভারতী অসাধারণ লাগল। যদিও আমি এবারেই প্রথম কিশোর ভারতীর পুজো সংখ্যা পড়ছি। তবুও গল্প, উপন্যাস, নিবন্ধ কিংবা ছড়া-কবিতা—সবদিক দিয়ে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ পুজোবার্ষিকী আমার এর আগে চোখে পড়েনি। কমিক্‌সগুলোও অসাধারণ। উপন্যাসগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লেগেছে 'হেরে যাবেন জগুমামা'। এছাড়াও 'ছোটি ডোঙ্গরির চিতা', 'আমি আজাদ হিন্দের সৈনিক'ও দারুণ। গল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো লাগল 'গণ্ডারের হাসি' আর 'হরিরামপুরের বাঘ' গল্প দুটো। এ ছাড়াও 'বৈকুণ্ঠ', 'পুরন্দর দ্য ম্যাজিশিয়ান', 'আব্দু ডাকাত', 'ভূতের বাজনা বেজেছিল' আর 'লোহার ডিম'ও ভালো লেগেছে। নিবন্ধগুলো প্রত্যেকটিই তথ্যে ভরপুর আর চিত্তাকর্ষক। সব মিলিয়ে এবার পুজোয় কিশোর ভারতীর জন্যই আনন্দ আরও বেড়ে গিয়েছিল। এমন একটা পুজো সংখ্যা উপহার দেওয়ার জন্য কিশোর ভারতীকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বিনয় বাগচী *কল্যাণনগর, মদনপুর, নদীয়া*

পাশের চিঠিখানা প্রকাশ করে 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধ-র লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করণে আনন্দিত হব। একই মনীষীর সম্বন্ধে বিশেষ করে জন্মদিন বা মৃত্যুদিন নিয়ে দুইরকম তথ্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই বিভ্রান্তি নিরীক্ষণে শ্রীশ্যামল চক্রবর্তী সাহায্য করতে পারেন, করলে বাধিত ও উপকৃত হব।

সেপ্টেম্বর সংখ্যা কিশোর ভারতী পড়লাম। অনেক লেখাই ভালো লাগল। বিশেষ করে ভালো লাগল শ্রী শ্যাম চক্রবর্তীর লেখা 'রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী' প্রবন্ধটি। ভালো লাগলেও একটি ব্যাপারে একটু দ্বিধান্বিত হওয়ায় এই পত্রাঘাত।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন ঃ 'রামেন্দ্রসুন্দরের অনুরোধে বড় লাটের কাছে লেখা চিঠির কপি পড়ে শোনান। চিঠি পড়া শেষ হয়। রামেন্দ্রসুন্দর চিরনিদ্রায় চলে যান। পাশে ছিলেন মনস্বী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।'

কিন্তু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চলমান জীবন' বইতে পড়েছি ঃ ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ১৯ জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ওই চিঠি পড়ে শুনিয়েছিলেন এবং তার দশদিন পরে ২৯ জ্যৈষ্ঠ রাত দশটায় রামেন্দ্রসুন্দরের মৃত্যু হয়।

শ্রীচক্রবর্তী লিখেছেন ঃ '১৯১৯ সালের ৬ই জুন রামেন্দ্রসুন্দর প্রয়াত হন।

১৩২৬ এর ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৯১৯ সালের জুন মাস হলেও ৬ তারিখ হতে পারে না। কার লেখা ঠিক বলে মানবো? শ্রীচক্রবর্তীকে অনুরোধ ঃ আমাদের এ সমস্যা দূর করুন।

লেখকের নিবেদন

একজন সামান্য কলমচির এমন একজন পাঠক রয়েছেন জেনে কী যে ভালো লাগছে লিখে বোঝাতে পারব না। আঘাতে মানুষ ব্যথিত হয়। আপনার পত্রাঘাতে আনন্দই পেয়েছি।

রামেন্দ্রসুন্দরের প্রয়াণ দিবস ৬ই জুন ১৯১৯। তথ্যটি আমি দুটো বইয়ে দেখতে পাই। রমাতোষ সরকার লিখিত সাহিত্য একাডেমি প্রকাশিত ইংরেজি জীবনকথার ৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত রয়েছে, "(6th June) 1919-Breathed his last"। দ্বিতীয় বইটি সংসদ প্রকাশিত 'সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান'। ওই বইয়ের সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৪৯০ পৃষ্ঠায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর প্রয়াণদিবস হিসেবে ৬ই জুন ১৯১৯ উল্লেখিত রয়েছে।

হাতের কাছে দুটি বইয়ে অভিন্ন তারিখ ছিল বলে কোন বিভ্রান্তি ছিল না। বিনয়বাবুর চিঠি পেয়ে অতিরিক্ত অনুসন্ধানে আগ্রহী হই। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ বসু রচনা সংকলনের 'আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর' রচনাটি পাঠ করি। সত্যেন্দ্রনাথ লিখছেন, '১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী মশায়কে দেখতে এলেন। রামেন্দ্রসুন্দর অনুরোধ করেন, বড়লাটের কাছে লেখা চিঠি স্বয়ং আপনার মুখে একবার শুনতে চাই।...কবিগুরু বিদায় নিলেন—এদিকে রামেন্দ্রসুন্দর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সে তন্দ্রা আর ভাঙল না, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দশটার সময় অকালে মহাপ্রয়াণ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর।' নির্ভুল তথ্য বিষয়ে আরও কেউ আলোকপাত করুন, নিবেদন রইল।

বাবুন দেবনাথ *রশিকপুর, বর্ধমান*

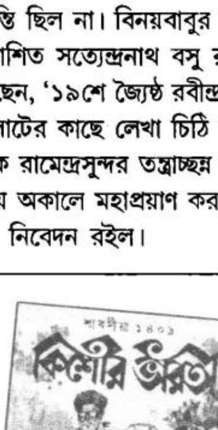

শুভ বিজয়া সম্পাদক মহাশয়। "শারদীয়া কিশোর ভারতী ১৪০৯" এক কথায় অতুলনীয়। সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ সেই ছোট বেলার "বাইসকোপ"-এর কথা মনে করিয়ে দেয়। আমাদের কথায় শিউলি ফুলের গন্ধ পেলাম না! রঘুনাথকে ভুলে গেলেও হরিঘোষের গোয়াল, স্মৃতির পটে থাকবে। খোকন তোমাকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে, আমি বলি কি তুমি মা-এর কাছে যাও কেমন! দিশার ঘরে দিশা ২৪ ঘণ্টা থাকতে পারলে ভালো হতো। তারাপদ রায় মহাশয়ের "তিন বুড়ির গল্প" সার্থক নাম। তিন জায়গায় তিন অভিজ্ঞতা, তাই না? নন্টে ফন্টে জনকল্যাণমূলক কাজ ভালো, ক্যাস্টর অয়েল দিয়ে কেল্টুকে ফাঁসাতে পারতে, স্যারের কী দোষ! জুরান নাথের কমিক্‌স ভালো, বগলার মেসোর "হাফসেঞ্চুরি" সেঞ্চুরি হবেই একদিন। এবার যাচ্ছি হরে কর কম! সত্যিই 'কম' এত কম, মাত্র ৩ পাতা, পঞ্চাশ কিংবা পাঁচশ পাতা হলে মন ভরতো। শারদীয়া কিশোর ভারতী নিয়ে লিখতে চাই অনেক, কিন্তু অন্যদেরকে তো লেখার সুযোগ দিতে হবে। তাই আপাতত নমস্কার।

ভ বা নী প্র সা দ মু খো পা ধ্যা য়

পৃথিবীর রহস্য

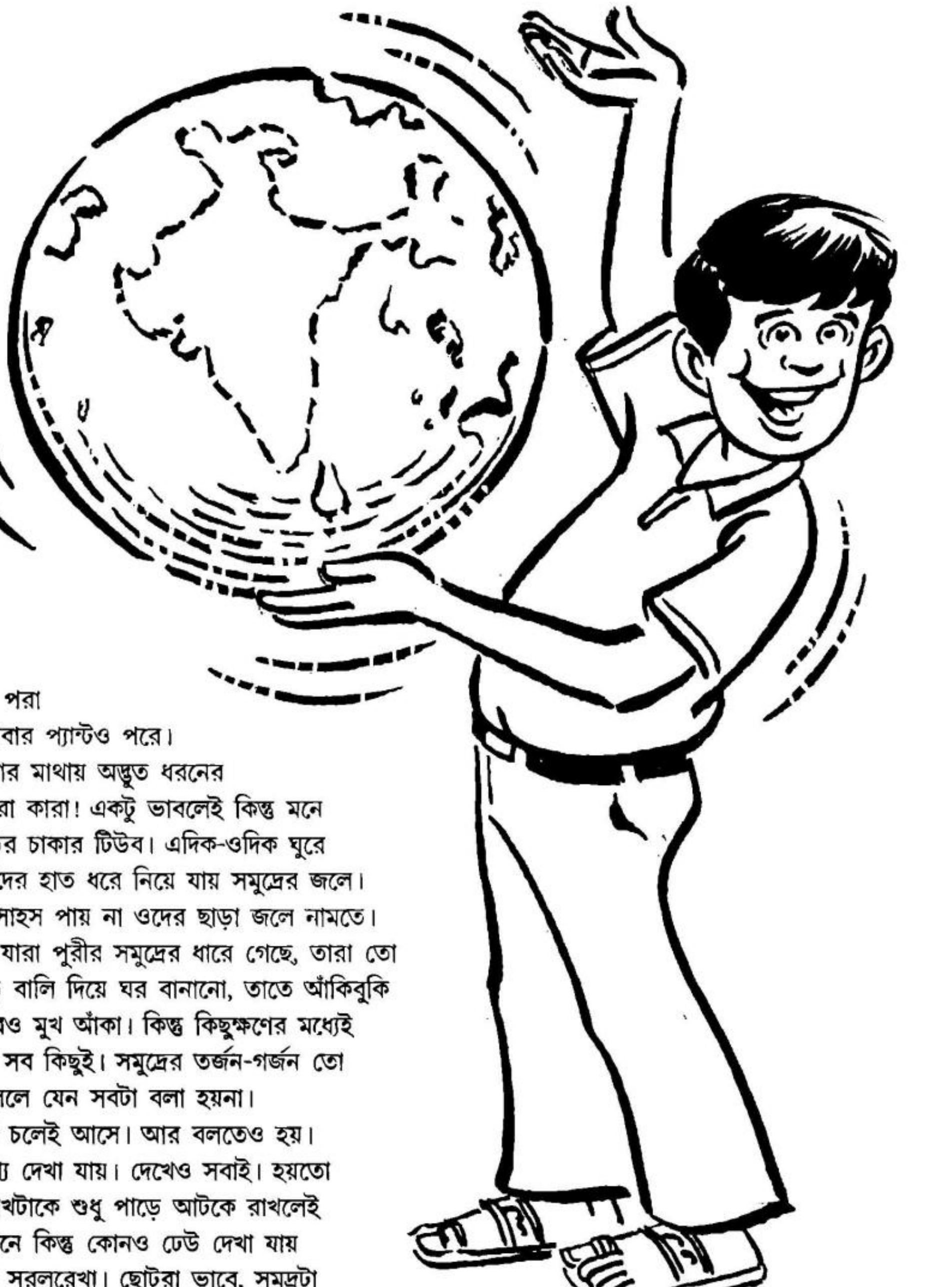

ওরা ভীষণই ব্যস্ত। হাঁটুর ওপর ধুতি পরা কতকগুলো মানুষ। কেউ-কেউ আবার প্যান্টও পরে। গায়ে গেঞ্জি, কখনও-বা জামাও থাকে। আর মাথায় অদ্ভুত ধরনের এক টুপি। দেখে শঙ্কুই মনে হয়। কিন্তু এরা কারা! একটু ভাবলেই কিন্তু মনে পড়ে যায়। কাঁধে থাকে বাতাস ভরা গাড়ির চাকার টিউব। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। আবার অনেকে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে নিয়ে যায় সমুদ্রের জলে। শুধু ছোটরা কেন! বড়রাও অনেকেসময় সাহস পায় না ওদের ছাড়া জলে নামতে।

এ ছবিটা বেশ চেনা জানা। অন্তত যারা পুরীর সমুদ্রের ধারে গেছে, তারা তো চেনেই। এরাই হল নুলিয়া। সমুদ্রের পাড়ে বালি দিয়ে ঘর বানানো, তাতে আঁকিবুকি কাটা, কখনও বা কাঠির টুকরো দিয়ে কারও মুখ আঁকা। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তো বড়-বড় ঢেউ আসে, ধুয়ে নিয়ে যায় সব কিছুই। সমুদ্রের তর্জন-গর্জন তো আছেই। এর সঙ্গে নুলিয়াদের কথা না বললে যেন সবটা বলা হয়না।

সমুদ্রের কথা বলতে গেলে এগুলো চলেই আসে। আর বলতেও হয়। এর বাইরেও কিন্তু একটা ভীষণ সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। দেখেও সবাই। হয়তো ততটা মন দিয়ে নয়। অবশ্য তারজন্য চোখটাকে শুধু পাড়ে আটকে রাখলেই হয়না। অনেক দূর নিয়ে যেতে হয়। সেখানে কিন্তু কোনও ঢেউ দেখা যায় না। মনে হয় একেবারেই শান্ত। ঠিক যেন সরলরেখা। ছোটরা ভাবে, সমুদ্রটা ওখানেই শেষ! যেখানে আকাশ মিশে যায় সমুদ্রের সঙ্গে। ভারি সুন্দর নীলিমায় নীল।

মাঝে মধ্যেই দেখা যায় দু-একটা ডিঙি নৌকা ভাসতে-ভাসতে চলেছে। ওদিকেই। একসময় পৌঁছেও যায়। মনে হয় আকাশের কাছাকাছি। তারপর হারিয়ে যায়। ওদের আর দেখা যায় না। এটা দেখার জন্য কিন্তু কোনও আলাদা আয়োজন করতে হয়না। শুধু চোখটাকে খুলে রাখলেই হয়।

এ চেনাজানা সমুদ্রেরই ছবি। তবে এর কথা বলতে গেলেই মনে পড়ে যায় আরেক ঘটনার কথা। সেটাও যে অজানা, তা কিন্তু নয়। তার সঙ্গে-সঙ্গেই চলে আসে এক বড় মাপের মানুষের নাম। সে নামটাও সকলেই জানে। অন্তত যারা ইস্কুলে পড়ে,

পিথাগোরাস

তাদের তো জানতেই হয়। কারণ তাঁকে বাদ দিয়ে আর যাই হোক, অঙ্ক শেখা যাবে না। পিথাগোরাস। গ্রিস দেশের মানুষ। খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় পাঁচশ বছর আগের কথা। সে-সময় তো বিজ্ঞানের এত কিছু জানা ছিল না। তাঁদের মতো মানুষেরাই নতুন-নতুন কতকিছু জানতে পেরেছিলেন। আর সেগুলোকে কাজে লাগিয়েই তো মানুষ আরও জানার সুযোগ পেয়েছে।

পিথাগোরাস শুধু যে অঙ্ক নিয়েই চর্চা করতেন, তা নয়। আকাশের তারা, গ্রহদের নিয়েও অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন জ্যোর্তিবিজ্ঞানীও। গ্রহদের কথা ভাবতে গিয়ে নিজেদের গ্রহটার বিষয়েও অনেককিছুই জেনেছিলেন। তখনও মানুষের মধ্যে নানান প্রশ্ন জাগত। পৃথিবী দেখতে কেমন! এর ভেতরে কী আছে? এটা কী দিয়ে বা কীভাবে তৈরি হল! এমন হাজারো প্রশ্ন।

সকলের মতো এসব প্রশ্ন পিথাগোরাসের মধ্যেও ছিল। তখন এখনকার মতো যন্ত্রপাতি ছিল না। কৃত্রিম উপগ্রহরাও আকাশে ঘুরে বেড়াত না। সে জন্য চোখ-কান খোলা রাখতে হতো। নানা ঘটনাকে দেখে যুক্তি দিয়ে ভাবতে হতো। সবাই যে ভাবতেন, তাও নয়। পিথাগোরাসের মতো বিজ্ঞানীরা সে কাজটা করতেন। আর সেভাবেই অনেক প্রশ্নের উত্তরও খুঁজে পেতেন।

আচ্ছা, সমুদ্রের কথা বলতে গিয়ে পিথাগোরাসের নামটা এলই বা কেন! আসলে ওঁকে নিয়েই যে শুরু। পিথাগোরাস একদিন সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েছিলেন। দেখলেন একটা জাহাজ ভাসতে-ভাসতে চলেছে সেই জায়গায়, যেখানে আকাশ মেশে সমুদ্রের সঙ্গে। কিন্তু ওখানে পৌঁছনোর পর জাহাজটা আর দেখা গেল না। জাহাজটা গেল কোথায়! পিথাগোরাস ভাবতে শুরু করলেন।

সেইসময় কিন্তু মানুষের কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিল। আসলে ভুলটা কিন্তু তাদের নয়। তখন তো আর এখনকার মতো মানচিত্রের বই ছিল না। তাই পৃথিবীর দেশ, মহাদেশ বা এত সাগর, মহাসাগরের কথা মানুষ জানত না। বেশিরভাগ মানুষই ভাবত পৃথিবী বলতে কেবল তাদের জায়গাটুকুই। সেটুকুই ডাঙা। আর তা গিয়ে শেষ হয়েছে যেখানে, সমুদ্রের শুরু সেখানে। কিন্তু সমুদ্রের শেষ কোথায়! অনেকেই ভাবত, ওই আকাশের গায়ে! আর তার পরে যারা যায়, আর ফেরে না। সত্যি সত্যি বেশিরভাগ মানুষ ফিরতেও পারত না। তা অবশ্য ওই কারণের জন্য নয়। সমুদ্রের মাঝে ঝড়-ঝঞ্ঝায় পড়ে মারা যেত।

কিন্তু পিথাগোরাসের মতো বিজ্ঞানীরা এত সহজে তা মেনে নিতেন না। তাঁরা আরও ভাবতেন। আর সে সময়কার জাহাজগুলো ছিল সবই পালতোলা। এখনও এরকম পালতোলা নৌকা দেখা যায়। ওই জাহাজটা, যাকে পিথাগোরাস দেখছিলেন, সেটা কিন্তু হঠাৎ চোখের আড়ালে চলে যায় নি। আস্তে-আস্তে, প্রথমে জাহাজের শরীরটা তারপর পাল। অল্প-অল্প করে পুরোটাই চোখের বাইরে হারিয়ে গেল। পিথাগোরাস বললেন, ওখানে সমুদ্রের শেষ নয়। তারপরেও রয়েছে সমুদ্র। এরকম ঘটার কারণটা অন্য।

আসলে পৃথিবীর ওপরটা সমতল নয়। পৃথিবীর চেহারাটা গোলকের মতো। আর সেভাবেই পৃথিবীর পিঠও বাঁকা। পিথাগোরাসের কাছ থেকেই পৃথিবীর চেহারার ধারণাটা প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। তারও প্রায় তিনশ বছর পর একথাই বলেছিলেন বিজ্ঞানী ইরাটোসথেনিস। তিনিও একজন বিজ্ঞানী। পৃথিবীর একসময়কার সব থেকে নামকরা 'লাইব্রেরি' ছিল আলেকজান্দ্রিয়ায়। ওই 'লাইব্রেরি'র দায়িত্ব ছিল ইরাটোসথেনিসের। সময়, খ্রিস্টের জন্মের দুশ বছরেরও আগে।

সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়েই কিন্তু পিথাগোরাস এত বড় একটা ধারণা দিতে পেরেছিলেন। তাতে পৃথিবীর চেহারা সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণাটা ভেঙেছিল। এভাবেই পৃথিবী নিয়ে অনেক কিছুই জানা গেছে। আর এখন, আগেকার সেসব মানুষদের ধারণার কথা শুনলে বেশ অবাক লাগে। মনে হয় তারা কীরকম অদ্ভুত, বোকা-বোকা ধারণা করত!

পৃথিবীর নানান দিক নিয়ে তারা যেমন ভাবত, তেমনি তার জন্ম নিয়েও তো চিন্তা করত। এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবী কীভাবে তৈরি হয়েছিল? এটা জানার আগ্রহ এখনও বিজ্ঞানীদের আছে। তাঁরা এখনও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন। বেশ কিছু ধারণার কথা জানাও গেছে। সকলে একমত হন নি। অবশ্য বিজ্ঞান গবেষণায় এমনটা হয়েই থাকে। বিভিন্ন জন বিভিন্ন ভাবনার কথা বলেন। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর হয়তো সকলে একমত হন। তাই এ নিয়েও এখনও পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতের অমিল রয়েছে।

বিজ্ঞানের কিন্তু একটা মজার দিকও আছে। প্রথমে কোনও না কোনও ধারণার কথা জানা যায়। বিজ্ঞানীদের থেকে হতে পারে, আবার সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে থেকেও হয়।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

লর্ড কেলভিন

সেটা কতটা ঠিক জানতে গিয়েই কিন্তু শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজকর্ম।

পৃথিবীর জন্ম নিয়েও একটা ধারণার কথা জানা যায়। সেটা অবশ্য শুরুর সময়ের ধারণা। পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল হঠাৎ। এরকম হঠাৎ কোনও কিছু ঘটার ধারণাটা শুধু পৃথিবীর জন্ম নিয়েই নয়, অনেক কিছু নিয়েই করা হয়। একদল মানুষের এটা বিশ্বাস। পৃথিবীর ওপর যে সব ঘটনা ঘটে, সেগুলো হঠাৎই ঘটেছে বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা মানতে চান না। এরও কারণ আছে। তাঁদেরও তো একটা বিশ্বাস আছে। তা হল, যে কোনও ঘটনা ঘটার জন্য একটা কারণ থাকবেই। এটাই বিজ্ঞানের নিয়ম। যাঁকে তাঁরা বলেন, কার্য-কারণ-সম্পর্ক।

স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীরা অনেক চিন্তাভাবনা করে একটা ধারণা দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল দুর্ঘটনার কারণে। এ ধারণার কিন্তু একটা নামও দিয়েছেন। বিপর্যয়বাদের প্রকল্প। কিন্তু অনেকেই এটা মেনে নেন নি। তাঁরাও না মানার জন্য বেশ কিছু কারণের কথা বলেছিলেন। কিন্তু শুধু কোনও ধারণাকে নাকচ করলেই তো হয়না। একটা নতুন কিছু ভাবনা দিতে হয়। তাও পাওয়া গেছে। তাতে অবশ্য ঠিক উলটো ঘটনার কথা বলা হয়েছে। পৃথিবীর জন্মের একটা ধারা আছে। কতকগুলো ধাপ পেরিয়ে এসে তৈরি হয়েছে পৃথিবী। এটাও যে সকলে মেনে নিয়েছেন, তা নয়। ফলে একেও তত্ত্ব না-বলে 'প্রকল্প'ই বলা হয়েছে। নামটা, বিবর্তনের প্রকল্প।

পৃথিবীর জন্ম নিয়ে নানান মত ছিল। এখনও আছে। কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটা প্রশ্নও মানুষের মধ্যে এসেছিল। সেটা হল জন্মের দিনক্ষণ নিয়ে। কখন বা কতদিন আগে এর জন্ম! প্রশ্নটা কঠিন। কিন্তু ভেবেচিন্তে একটা উত্তর কেউ কেউ দিয়েও ফেলেছিলেন। শুধু পৃথিবীর বয়স বা কতদিন আগে এ গ্রহটা তৈরি হয়েছিল, তা-ই নয়। নির্দিষ্ট সময়, বছরটাও বলে ফেলেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০৪ সালের ২৬ অক্টোবর, সকাল ৯টায়। অনেকে তো রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। যে কোনও মানুষই অবাক হবেন। বলা যায়, কেউই এ ধারণাকে মানলেন না। আর এরকম ধারণাকে মেনে নেওয়ার কোনও সুযোগই ছিল না। কারণ তাঁর আগে এ সম্পর্কে অনেকটাই ভেবেছিলেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। ইতালির মানুষ। তাঁকে 'মোনালিসা'র শিল্পী হিসাবেই অনেকে জানে। কিন্তু তিনি একজন বড়মাপের বিজ্ঞানীও ছিলেন। প্রকৃতির নানান ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে ভাবতেন, তা জানা যায় তাঁর 'নোটবই'-এ।

ভিঞ্চিই প্রথম বলেছিলেন, পৃথিবীর ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলো পালটে যায় এবং এই ধারণা তিনি রীতিমতো যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পনেরো শতকে। তার আগে মানুষ ভাবত পাহাড়, নদীর মতো নানান বৈশিষ্ট্যগুলো চিরকাল একইরকম থাকে। তা পালটায় না। ভাবলে অবাক হতে হয়, মানুষ ৫০০ বছর আগেও এরকম চিন্তা-ভাবনা করত!

কিন্তু মানুষের ভূগোলের ধারণা বাড়তে শুরু করেছিল। ফলে অনেকেই বুঝেছিলেন যে আগেকার ধ্যান-ধারণা ঠিক নয়। ভিঞ্চি যখন আল্পস পর্বতে গিয়েছিলেন, তিনি আরও নতুন-নতুন তথ্য পেয়েছিলেন। ঝিনুক পেয়েছিলেন পাহাড়ের অনেক উঁচু জায়গায়। এরসঙ্গে বেশ কিছু জলে থাকা প্রাণীদের খোলকও পেলেন। সেগুলো চাপা পড়ে ছিল পাললিক শিলার মধ্যে। বেশ অবাক হলেন। পাহাড়ের অত উঁচুতে জলে থাকা প্রাণীরা এল কীভাবে?

এ নিয়েও একটা ধারণা কিন্তু মানুষের মধ্যে ছিল। পৃথিবীতে নাকি একবার সাঙ্ঘাতিক বন্যা হয়েছিল! 'মহাপ্লাবন' বলা হয়। আর প্রায়

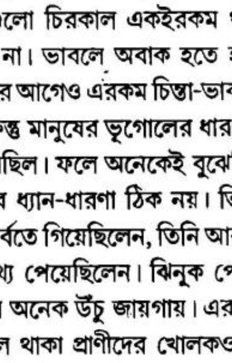

বেকেরেল

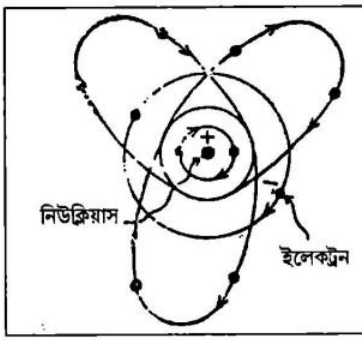

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে থাকে ইলেকট্রনরা। অনেকটা সৌরজগতের মতই। যেমন সূর্যকে ঘিরে থাকে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুরা

৪০ দিনের এই বন্যায় নাকি 'আল্পস' পাহাড়টাও পুরোটাই জলের তলায় চলে গিয়েছিল! এসব জলজ প্রাণীরা সে সময়ই পলির মধ্যে চাপা পড়ে।

লিওনার্দো এ ধারণার সঙ্গে একমত হলেন না। তিনি তাঁর 'নোটবই'-এ সে কথা লিখেছেন। মাত্র ৪০ দিন সময়ে অত প্রাণী সমুদ্রেরতট থেকে আল্পসে পৌঁছতে পারে না। কারণ আল্পস থেকে কাছাকাছি সমুদ্রতটের দূরত্বটা কম নয়। প্রায় কয়েক শ কিলোমিটার তো হবেই।

অন্য বিজ্ঞানীরাও একমত হলেন লিওনার্দোর সঙ্গে। তাঁদের যুক্তিটা ছিল অন্য। তাঁরা বলেছিলেন ওই নির্দিষ্ট দিন, সময়টা পুরোপুরিই অবাস্তব। আর পৃথিবীর বয়স এত কম হতে পারে না। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠে জমা হয়েছে কয়েক হাজার মিটার পলি। এক মিটার পলি জমা হতেই অনেক সময় লাগে। আসলে এই পলিগুলো জমাট বেঁধেই তো পাললিক শিলা তৈরি করে। তার নির্দিষ্ট কতকগুলো নিয়ম আছে। সেজন্যও অনেকটাই সময়ের দরকার হয়। তাই ৪০০৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পৃথিবী তৈরির ভাবনাটা কোনওভাবেই ঠিক নয়।

কিন্তু চিন্তা-ভাবনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ থেমে থাকে নি। তা চলছিলই। এক-একজন নতুন নতুন উপায়ের কথা বলেছিল। সবক্ষেত্রেই কিছু-না-কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। পৃথিবীর মধ্যে বিভিন্ন উপাদানগুলো তো একসঙ্গে বা জন্মের সময় থেকেই পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা এটা বুঝতে পেরেছিলেন। পৃথিবী তৈরি হওয়ার পর আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। সে আবহমণ্ডলে আজকের মতো ছিল না। তখনও নানান গ্যাসীয় উপাদান ছিল।

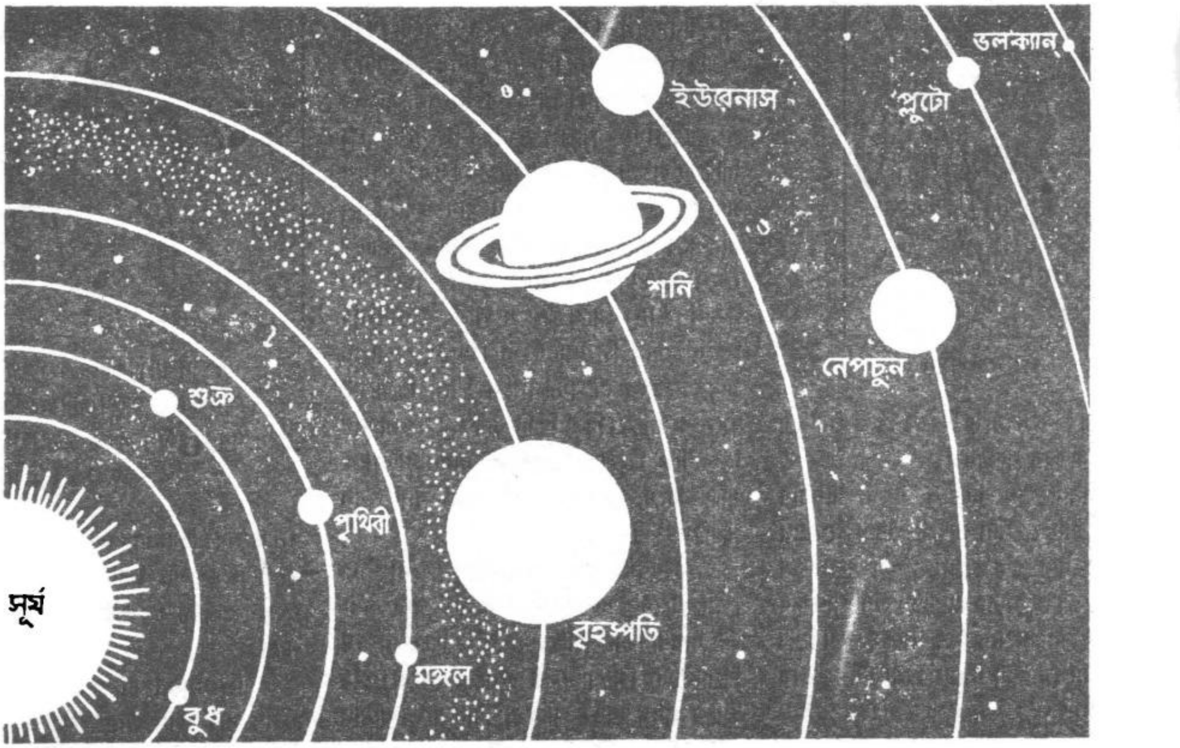

সূর্যের সংসার

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, অক্সিজেন। কিন্তু অনুপাত পুরোপুরি আলাদা ছিল। ফলে আবহমণ্ডল তৈরি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই পৃথিবীতে জীবন আসেনি। তারপর আবহাওয়া পালটেছে। উপাদানের অনুপাতগুলোও জীবদের টিকে থাকার মতো হয়েছে। তারপর এসেছে প্রাণের স্পন্দন।

এই প্রতিটি ধাপের মধ্যে সময়ের ফারাক আছে। পৃথিবীর বয়স বেড়েছে। নতুন-নতুন সব মণ্ডল তৈরি হয়েছে। আবহমণ্ডল, জীবমণ্ডল, শিলামণ্ডল। প্রথম দিকে যাঁরা পৃথিবীর বয়স বের করার উপায়ের কথা বলছিলেন, তাঁদের উপায়গুলোর মধ্যে কিন্তু এরকম ভাবনাটা ছিল না। এই মণ্ডলগুলো তৈরি হওয়ার মধ্যে সময়ের ফারাকের কথাগুলো তাঁরা বলতে পারেন নি। ফলে বিজ্ঞানীরা সে সব উপায়কে মেনে নিতে রাজি হলেন না। কিন্তু একটা উপায় তো দরকার। বিজ্ঞানীরাও নাছোড়বান্দা। চলল পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রমাণ, তথ্য জোগাড় করার কাজ।

অনেক দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উনিশ শতকে এক বিজ্ঞানী নতুন ধারণা দিলেন। তাঁর নাম অবশ্য এখন সবাই জানে। ব্রিটেনের মানুষ, পদার্থবিদ্যায় গবেষণা করেছেন। তাঁর বিষয় ছিল তাপ আর তাপমাত্রা। তাপমাত্রা মাপার জন্য একটা উপায়ও বের করেছিলেন। বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন। 'কেলভিন স্কেল' তো এখন প্রায় সকলের মুখে মুখে শোনা যায়। তিনি কিন্তু এই 'তাপ'-এর ধারণাকেই কাজে লাগিয়ে ছিলেন পৃথিবীর বয়স জানার জন্য।

আসলে ঠিক জন্মের সময় পৃথিবীর একটা বিদ্‌ঘুটে চেহারার কথা বিজ্ঞানীরা বলেন। সাঙ্ঘাতিক গরম। একটা আগুনের বল। আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়েছে। তারপর কঠিন চেহারা নিয়েছে। বিজ্ঞানী কেলভিন বলেছিলেন, ঠান্ডা হওয়ার জন্য তার শরীর থেকে তাপ ছাড়তে হয়েছে। অর্থাৎ তাপ বিকিরণ হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন, তাপটা সবদিক দিয়েই হয়তো বেরিয়েছে, কিন্তু একই অভিমুখে। এইভাবে ঠান্ডা হওয়ার সময়টাকে বের করেছিলেন। সেভাবে একটা বয়স পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সে হিসাবটা তাঁর নিজেরই মনের মতন হল না।

তিনি দেখেছিলেন, ওইভাবে তাপ ছাড়ার ঘটনা ঘটতে থাকলে মাত্র চার কোটি বছর সময় লাগার কথা সূর্য নিভে যাওয়ার জন্য। তিনি তো বিজ্ঞানী। স্বাভাবিকভাবেই যুক্তি ছাড়া কোনও কিছু মেনে নিতে চান না। তা যদি নিজের ধারণা হয়, তাতেও। তবে হতাশ হয়েছিলেন। সঙ্গে পরীক্ষার কাজটাও চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁর চেষ্টাটা অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল বেশ কয়েক বছরের মধ্যেই। ফ্রান্সে এক বিজ্ঞানী গবেষণা করছিলেন পদার্থবিদ্যায়। তিনি হঠাৎই আবিষ্কার করলেন এক অদ্ভুত বিষয়। কিছু কিছু পরমাণুর নিউক্লিয়াস ছটফট করে। ধীর, স্থির, শান্ত হওয়ার চেষ্টা করে। সে জন্য তাদের ভাঙাচোরার কাজটাও করতে হয়। কিন্তু পরমাণুর নিউক্লিয়াস তো আর এমনি এমনি ভাঙবে না। সেখান থেকে বেরিয়ে আসে এক ধরনের বিকিরণ। তার ক্ষমতাও সাঙ্ঘাতিক। তবে সব বিকিরণ যে একইরকম হয়, তাও নয়। তাদের মধ্যে গুণাগুণের তফাৎ তো থাকেই। সেগুলোকে আলাদা করার জন্য বিজ্ঞানীরা নানান নামও দিয়েছেন। আলফা, বিটা কিংবা গামা রশ্মি।

ফ্রান্সের এক বিজ্ঞানী এটা জানতে পেরেছিলেন উনিশ শতকের শেষের দিকে। সালটা, ১৮৯৬। আর বিজ্ঞানীর নামটা হয়তো খুব বেশি শোনা না-গেলেও বিজ্ঞানের ছাত্রদের তো জানাই। আন্তয়নে হেনরি বেকেরেল।

তাঁর এই নতুন আবিষ্কার নিয়ে বেশ হইচই হচ্ছিল বিজ্ঞানী মহলে। হবারই কথা। সেই পরমাণুর ভাঙা, তার থেকে বেশ

ক্ষমতাশালী শক্তি বেরিয়ে আসাটাই এখনকার পৃথিবীর কঠিন কঠিন সমস্যা মেটাচ্ছে। এর একটা নামও আছে। বিজ্ঞানীরা বলেন 'তেজস্ক্রিয়তা।' এ নিয়ে আরও গবেষণা চলল। অবশ্য এখনও চলেছে।

আসলে কোনও পরমাণুর নিউক্লিয়াস পালটে গেলে পরমাণুও পালটে যাবে। ভেঙে গেলে তার স্বভাবগুলোও পালটে যায়। অন্য একটা নতুন পরমাণু তৈরি করে। এতে আগের ছটফটানি অনেকটা কমে। অনেক শান্ত হয়ে যায়। আর সহজে ভাঙতে চায় না। বিজ্ঞানীরা এই সময়টা মাপতে চাইলেন। পুরো ঘটনাটা ঘটতে কত সময় লাগে? সমস্যাও দেখা গেল। সব পরমাণুর ক্ষেত্রে সময়টা কিন্তু একইরকম হয়না।

আর পরমাণু তো কোনও মৌলেরেই উপাদান। এরকম অনেক পরমাণু মিলেমিশে মৌল তৈরি করে। সে মৌলটাকেও বলে 'তেজস্ক্রিয় মৌল'। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম নামগুলো তেজস্ক্রিয় মৌলেরই। পরমাণু ভেঙে নতুন পরমাণু তৈরি হলে মৌলটাও পালটে যাবে। নতুন মৌল পাওয়া যাবে। একক ভরের কোনও মৌল অন্য মৌলে পালটাতে হলেও কিছুটা সময়ের দরকার। বিজ্ঞানীরা এই এককভরের অর্ধেকটা পালটানোর সময়টাকে হিসাব করলেন। তাতে অন্তত ভেঙে যাওয়ার হারটা বোঝা যাবে। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে তেজস্ক্রিয় মৌলের 'অর্ধেক জীবন।'

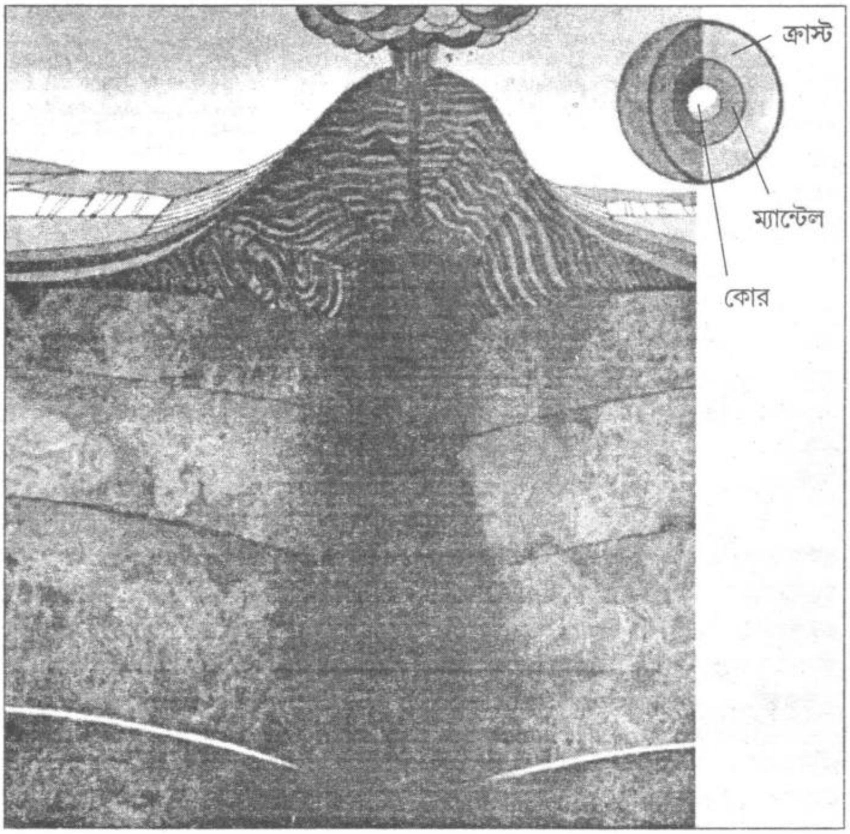

পৃথিবীর ভেতরের গঠন

এরও আবার একটা মজার বিষয় আছে। এক-এক তেজস্ক্রিয় মৌলের 'অর্ধেক জীবন' এক-এক রকম। কখনও তা সবার সমান হয়না। আবার পালটায়ও না। 'অর্ধেক জীবনটা' কোনও নির্দিষ্ট তেজস্ক্রিয় মৌলের জন্য নির্দিষ্ট। সে-সময়টা দু-এক বছর নয়। এক গ্রাম ইউরেনিয়াম যদি ভেঙে চুরে আধগ্রাম ইউরেনিয়াম হতে চায়, সময় লাগবে ৪৫,০০০ লক্ষ বছর। ভূবিজ্ঞানীদের বেশ সুবিধাই হল। তাঁরা খুঁজে খুঁজে এ ধরনের তেজস্ক্রিয় মৌল বের করলেন। শিলার মধ্যে থেকে। শিলার মধ্যে তা থাকেই। আসলে শিলা তৈরি হয় 'মণিক' দিয়ে। মণিক নামটা নতুন শোনালেও এর ইংরাজিটা কিন্তু সবাই জানে। 'মিনারেল'। কিন্তু ভূবিজ্ঞানীরা কাকে 'মিনারেল' বা 'মণিক' বলবেন, সে সম্পর্কে খুব কড়া কিছু নিয়মও বেঁধে দিয়েছেন।

তাঁদের ভাষায় 'মণিক' হল রাসায়নিক যৌগ। প্রকৃতির মধ্যে তৈরি হয়। প্রকৃতি নিজের উপায়ে তা তৈরি করে। আর যৌগ হলেই মৌল দিয়ে তৈরি হতে হবে। অবশ্য তার জন্য কতকগুলো শর্ত আছে। নির্দিষ্ট চাপ, তাপের দরকার হয়। এই মৌলগুলোর মধ্যেই তেজস্ক্রিয় মৌল থাকে। তাই মনিকগুলোকে ভালো ভাবে পরীক্ষা করলে তেজস্ক্রিয় মৌল খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে।

ভূবিজ্ঞানীরা সেভাবেই তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে শিলার বয়স জানতে পারেন। আর পদার্থবিজ্ঞানীরা তো 'অর্ধজীবন' হিসাব করে বের করেই দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত কিন্তু এই উপায়টাই বেশ কাজে লেগেছিল। পৃথিবীর বয়স এখন জানাও গেছে। চারশ পঞ্চাশ কোটি বছরেরও বেশি।

বিজ্ঞানীরা অনেকটাই নিশ্চিন্ত হলেন। আর সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তরও দেওয়া গেল। এটা তো ঠিকই, যে জায়গাটায় থাকা, তার বয়সটা না জানলে ভালো লাগে না। ভূবিজ্ঞানীরা এবার অনেকটা নিয়মমাফিক এগোনোর চেষ্টা করলেন।

চারশ পঞ্চাশ কোটি বছরের একটা ইতিহাস আছে। পৃথিবী তখন থেকেই কাজ করে চলেছে। কখনও থামে নি। অবশ্য থামলেই বিপদ। আর সেই কাজের জন্যই পালটেছে পৃথিবীর ভেতরের, বাইরের উপাদানগুলো। বিজ্ঞানীরা বুঝতে চাইছিলেন এই পালটানোর ধারাটা। সেটাও কিন্তু কম রোমাঞ্চকর নয়!

সূর্যের সংসারটা তো ছোটখাটো নয়, গ্রহ-উপগ্রহদের নিয়ে হাঁক-ডাক ছেড়ে রাজার মতো সে মধ্যমণি। কিন্তু পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও এত পশুপাখি, গাছপালার খবরাখবর পাওয়া যায় নি। বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করছেন। সেরকম প্রমাণ পান নি। এটা হল কীভাবে! সে উত্তর নিয়েও বিশেষজ্ঞরা একমত নন। তবে এটা ঠিক, পৃথিবীতে এই জীবজগৎ তৈরি হওয়ার মতো একটা অবস্থা পাওয়া গিয়েছিল, তা নাহলে তো মানুষই জন্মাত না। চারশ পঞ্চাশ কোটি বছর আগে সেরকম অবস্থা ছিল না। সেজন্যই বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর জন্মের পরও প্রায় তিনশ কোটি বছর কোনও প্রাণের চিহ্ন খুঁজে পান নি।

তবে এতগুলো বছর কিন্তু পৃথিবী শুধু শুধু কাটায় নি। এসময়টায় পালটেছে পৃথিবীর

আবহমণ্ডল, নানান ধরনের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন হয়েছে। আর সেটা খুব সহজেই কিন্তু বোঝা যায়। সূর্য বা মহাজাগতিক যে অংশটা রয়েছে পৃথিবীর বাইরে, তার সঙ্গে তো সাঙ্ঘাতিক পার্থক্য রয়েছে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের। তা যদি না হতো তবে পৃথিবীর জলের পরিমান কমে যেত প্রায় দশ লক্ষ ভাগ। নাইট্রোজেন বেশি হতো প্রায় দু লক্ষগুণের কাছাকাছি, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রায় দেড় হাজার গুণ বেড়ে যেত। কমে যেত অক্সিজেন। অন্তত ১/৩৪০ ভাগ। এই হিসাব কিন্তু বিজ্ঞানীরাই দিয়েছেন। এতে আর যাই হোক, এত জীব বেঁচে থাকতে পারত না। জীবমণ্ডলও তৈরি হতো না।

তা কিন্তু হয় নি। এর কারণই হল রাসায়নিক বিবর্তন। অথচ পৃথিবীর বাইরে যে মহাজাগতিক মেঘ ঘিরে রয়েছে, সেখানে এরকমটাই পাওয়া যায়। আর সেজন্যই তো জীবরা থাকতে পারে না। এটা ঘটেছে পৃথিবীর পৃষ্ঠের বাইরের দিকটায়। ভেতরটায় কী হয়েছে?

পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে যদি সরাসরি ফুঁড়ে ঢুকে যাওয়া যায় তবে যাওয়া যাবে মাত্র ৬৩৭৮ কিলোমিটারের কাছাকাছি একটা দূরত্বে। সেটাই পৃথিবীর কেন্দ্র। তবে এরকম ভাবাটা ভীষণই অবাস্তব। পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে আস্তে-আস্তে চাপ, তাপ বাড়তে থাকে। যত নিচে যাওয়া যায় তত বেশি হয়। সব জায়গায় যে একই হারে বাড়ে, তাও নয়। কম বেশি হয় এই হারের। তাতে মানুষ তো দূরের কথা, কোনও যন্ত্রপাতিই বেশিদূর ঢুকতে পারে না। অকেজো হয়ে যায়, গলে যায় ওই ভয়ংকর তাপমাত্রায়। নষ্ট হয়ে যায় ওই চাপে।

বিশ শতকের ছয়ের দশকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা এরকম একটা চেষ্টা করেছিলেন। মাটি ফুঁড়ে যন্ত্রপাতিকে নিচে পাঠাতে। তাতে অন্তত সেখানকার শিলার কিছু নমুনা পাওয়া যাবে। বোঝা যাবে কী আছে! তা ঢুকতে পেরেছিল মাত্র ৩৬ মিটার পর্যন্ত। তারপর আর কাজই করতে পারে নি যন্ত্রপাতি। বাধ্য হয়ে বিজ্ঞানীরা ওই চেষ্টা আর করেন নি।

তবে একটা ধারণা কিন্তু পেয়েছেন। উপাদানগুলোর সম্পর্কে কিছু তথ্যও তাঁদের কাছে রয়েছে। সেটা সরাসরি পান নি। অন্যভাবে। তাতে দেখা গেছে ভেতরে বেশিরভাগটা কঠিন শিলা দিয়ে তৈরি। আবার গ্যাসীয়, তরল উপাদানও আছে। এদের রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করা হয়েছে। তা থেকে তিনটে ভাগ করতে পেরেছেন। আর তা বোঝার জন্য আলাদা আলাদা নামও দিয়েছেন। 'ক্রাস্ট', 'ম্যান্টেল' আর 'কোর'।

পৃথিবীপৃষ্ঠের ঠিক নিচেই রয়েছে 'ক্রাস্ট'। পুরোপুরি ভেতরের ভাগটা হল 'কোর।' আর এই দুয়ের মাঝে 'ম্যান্টেল'। প্রত্যেকের শিলার ধরন, গুণাগুণ আলাদা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই আলাদা হওয়ার ঘটনাটা ঘটেছে কিন্তু আস্তে-আস্তে, সময় লেগেছে। পৃথিবী যখন গরম থেকে ঠান্ডা হয়েছে, তখনই রাসায়নিক মৌলগুলোও একটা নির্দিষ্ট নিয়মে নিজেদের জায়গা খুঁজে নিয়েছে। তারপর তারা পছন্দ মতো তাপ আর চাপে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যৌগ তৈরি করেছে। সেই যৌগগুলোই তো মনিক। ঘটনাটা অনেকটা কাদাগোলা জল থেকে কাদার কণাগুলো থিতিয়ে পড়ার মতো। খুব ভালো ভাবে দেখলে কিন্তু সেখানেও একটা নিয়ম খুঁজে পাওয়া যায়। নিচে ভারী, মোটা দানাগুলো থাকে। তাদের ওপরে থাকে তুলনায় কম ভারী দানাগুলো। সবচেয়ে ওপরে পরিষ্কার জল।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবী ঠান্ডা হওয়ার সময় মৌলগুলো অনেকটা এই নিয়মেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সেজন্যই 'কোরে' পাওয়া যায় 'আয়রণ' বা লোহা, ম্যাগনেসিয়ামের মতন মৌল। কিন্তু 'ক্রাস্টে' রয়েছে 'সিলিকন', 'অ্যালুমিনিয়ামের' মতন হালকা মৌল। রাসায়নিক মৌলগুলোরও তো ওজন থাকে। কেউ হালকা হয়। কেউ আবার ভারীও হয়।

পৃথিবীর বাইরের খোলক বা বায়ুমণ্ডলে নানান মৌল, যৌগ কমেছে বা বেড়েছে। একইভাবে ভেতরটাতেও কিন্তু পরিবর্তন হয়েছে। পৃথিবী নিজের চেহারাটাকে আস্তে-আস্তে পালটেছে।

সেজন্যও কম সময় লাগে নি। এতে কিন্তু একটা সুবিধা হয়েছিল। প্রথমে এককোষী, খুবই সাদামাঠা জীবরা জন্মেছিল। ধীরে-ধীরে সেও পালটাতে শুরু করল তার শরীরটাকে। বহুকোষী জীবরা এল। শরীরের গঠনটাও আর আগের মতো থাকল না। বেশ জটিল হল। নতুন-নতুন প্রাণী, উদ্ভিদ দখল করে নিল পৃথিবী পৃষ্ঠের জায়গাগুলোকে। জলে, ডাঙায় থাকার

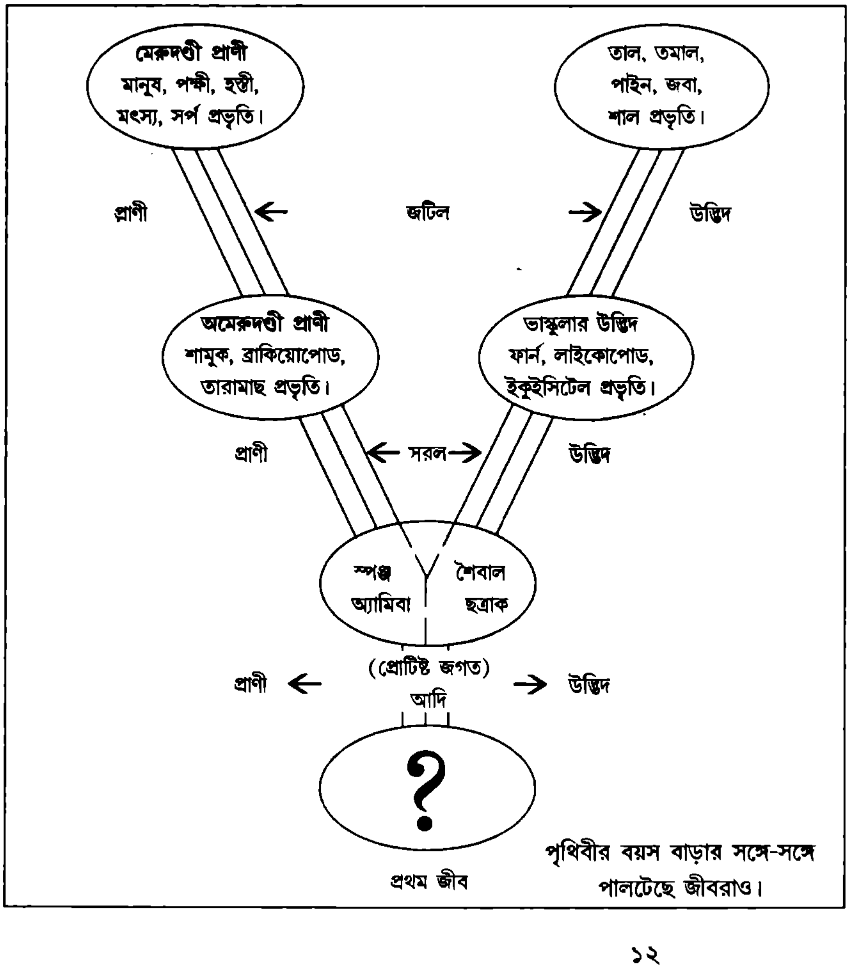

পৃথিবীর বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে পালটেছে জীবরাও।

মতো করে শরীরটাকে তৈরি করে ফেলেছিল। এটাও ভাবতে কিন্তু বেশ অদ্ভুতই মনে হয়। অবশ্যই ঘটনাগুলোও হঠাৎ-হঠাৎ ঘটে নি। এজন্য সময়ও লেগেছে। পৃথিবীর এক-একটা সময়ে এক এক ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ পাওয়া গেছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এরা উন্নতও হয়েছে।

মানুষ তো অনেক পরে এসেছে। তার আগে কত সব প্রাণীরা জন্মেছে। তারা যে সবাই আছে, তাও নয়। অনেক গাছপালা, পশুপাখি আর পাওয়াই যায় না। অনেকে আবার টিকেও গেছে। এ খবর বিজ্ঞানীরাই দিয়েছেন। সেজন্যও দরকার হয়েছে তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য। সেগুলোও রাখা থাকে শিলার মধ্যে। থরে থরে সাজানো থাকে শিলাগুলো। তবে সব শিলাই এসব খবর দিতে পারে না। এজন্য সবথেকে বেশি সাহায্য করে পাললিক শিলা। তাদের মধ্যে বেশ ভালো ভাবেই থাকে আগেকার হারিয়ে যাওয়া পশুপাখি, গাছপালার শরীরের ছাপ। এগুলোকে বলা হয় জীবাশ্ম। অনেক সময় আবার তাদের পুরো শরীরটা পাওয়া যায় না। হাতের ছাপ, পায়ের ছাপ, তাদের বিষ্ঠা, এগুলোও কম দরকারি নয়।

বিজ্ঞানীরা এগুলোই পরীক্ষা করেন। এতে অন্য আরেকটা কাজও হয়। পৃথিবীর কোনও নির্দিষ্ট সময়কে বোঝানোর জন্য এসব জীবদেরও ব্যবহার করা হয়। সেভাবে ভাগও করা হয়েছে। পৃথিবীর সব থেকে বেশি বয়সের জীবাশ্মের বয়স হল ৫৭ কোটি বছর। এর থেকে বেশি বয়সের জীবাশ্ম যে পাওয়া যায় নি, তা নয়। তবে সেগুলো নিয়ে ভূবিজ্ঞানীরা খুব নিশ্চিত নন। কেউ-কেউ আবার ভীষণভাবেই নিশ্চিত। এরমধ্যে না গিয়েই বিজ্ঞানীরা ৫৭ কোটি বছরকে তিনটে ভাগ করেছেন। পুরাজীবীয়, মধ্যজীবীয় আর নব্যজীবীয়। এ নামগুলো শুনলে আর বুঝতে অসুবিধা হয়না যে কীভাবে তাঁরা ভাগ করেছেন। সেদিক থেকে নামগুলো কিন্তু বেশ সহজ। অবশ্য ৫৭ কোটি বছরের আগেও দুটো ভাগ আছে। তার একটার নাম উষাজীবীয়, আরেকটা হল 'আর্কিয়ান'।

'জীবীয়' অংশটা তো জীবকে বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে। আর তার সঙ্গে 'পুরা,' 'মধ্য' বা 'নব' হল জীবদের বিবর্তনের এক একটা ধাপ।

যাইহোক না, একটা খুব সাধারণ জিনিস কিন্তু এথেকে বোঝা যায়। পৃথিবীর জন্মের পর থেকেই বিবর্তন হয়ে চলেছে। এক-একটা সময়ে এক এক ধরনের বায়ুমণ্ডল, শিলামণ্ডল যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি পাওয়া গেছে জীবমণ্ডলও। সবকিছুই অবিরত পালটেই চলেছে।

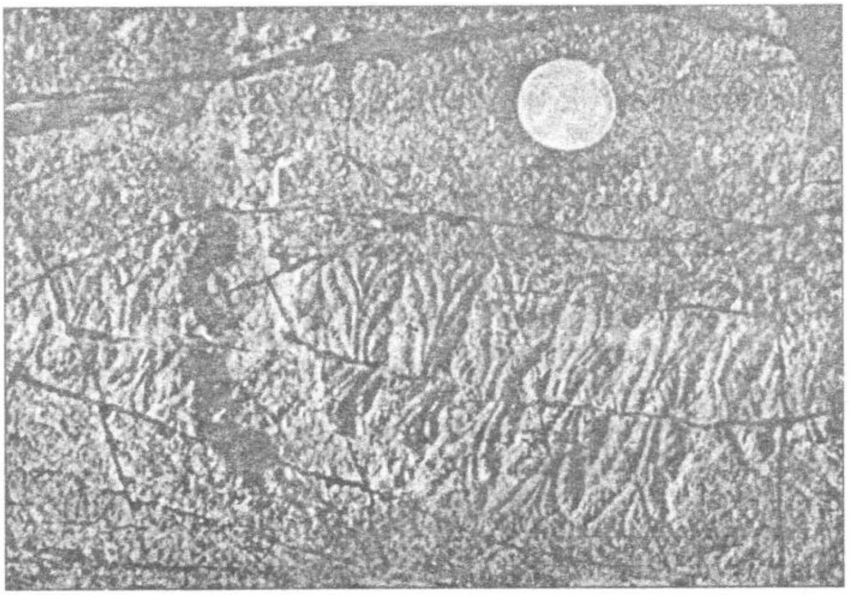

পাললিক শিলার মধ্যে চাপা পড়ে থাকা জীবদেহের ছাপ

এরকমভাবেই পালটায় পৃথিবীর মানচিত্রটাও। বিজ্ঞানীরা তার অনেক প্রমাণও পেয়েছেন। সে জন্য নতুন কিছু দরকার হয়নি, জীবদের পালটানোর ধারাটা তারা বেশ ভালভাবে ভেবেছিলেন। কোথায় শুরু সেটা জানার দরকার। শুধু সময়টাই নয়, কোন জায়গায়। পৃথিবীর সব জায়গায় তো এখনকার মতো একসঙ্গে গাছপালা, পশুপাখি জন্মায় নি। বিশেষ কিছু কিছু জায়গায় জন্মেছিল। তারপর তারা ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাতেও সবটা বোঝা যায় নি, একই সঙ্গে একই জীব পৃথিবীর দুটো জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল। অথচ যে জায়গাদুটো হয়তো একে অন্যের থেকে অনেক দূরে। দুটো দেশের জলবায়ুও এক নয়। আবার এখন সে সব জায়গায় যে ধরনের জলবায়ু রয়েছে, তাতে ওই জীবদের পাওয়ার কথা নয়। বিজ্ঞানীরা বেশ চিন্তায় পড়লেন। জীবজগতের বিবর্তনের ধারাটা জানার পরই এসব প্রশ্নগুলো আসতে শুরু করেছে।

অন্যদিকে ভূবিজ্ঞানীরাও দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তাদের সমস্যা অন্য। তাঁরা শিলা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। শিলাস্তরগুলোর মধ্যেও অদ্ভুত সব বৈশিষ্ট্য তাঁদের চোখে ধরা পড়ছিল। আসলে শিলার কিন্তু একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে। তার মধ্যে অনেক কিছু লুকোনো থাকে। শুধু জীবাশ্মই নয়, তাদের জন্মের ইতিহাসও খুঁজলে পাওয়া যায়। এমনকী সেখানকার অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের কাজকর্মের চিহ্নও থাকে। কোনও জায়গায় শিলার ওপর যদি নদী কিংবা হিমবাহ কোনও সময়ে কাজ করে, সেটার চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যায়।

ভূ-বিজ্ঞানীরা দেখছিলেন কিছু-কিছু শিলাস্তরের মধ্যে হিমবাহের কাজকর্মের ছাপ রয়েছে। কিন্তু সেসব শিলাগুলো যেখানে রয়েছে, সেখানে কোনও সময়ই হিমবাহ থাকার কথা নয়। আবার ওই একই ধরনের শিলাস্তর পৃথিবীর আরও বেশ কিছু জায়গায় পাওয়া গেল। সেগুলোও মেলাতে পারা যাচ্ছিল না। তাহলে কীভাবে ওইসব শিলাস্তর এল আর কোত্থেকেই বা এল!

ভূ-বিজ্ঞানীদের আর জীববিজ্ঞানীদের সমস্যার মধ্যে কিন্তু একটা জায়গায় মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল। তা হল, যার যেখানে থাকার কথা নয়, সেখানেই রয়েছে। কিন্তু এগুলো হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনও কিছু নয়। কারণও আছে। সবক্ষেত্রে যেটা হয়, এখানেও তাই হচ্ছিল। নানান মত পাওয়া গেল। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কটা যুক্তি সম্মত না-হলে বিজ্ঞানীরা থামেন না।

এরকম অবস্থায় বেশ কিছু বিজ্ঞানী নতুন এক জিনিস লক্ষ্য করলেন। তাঁরা বেশ ভালো করে মানচিত্রটা লক্ষ্য করেছিলেন। দেখলেন, পৃথিবীর মহাদেশের সীমানাগুলোকে এক

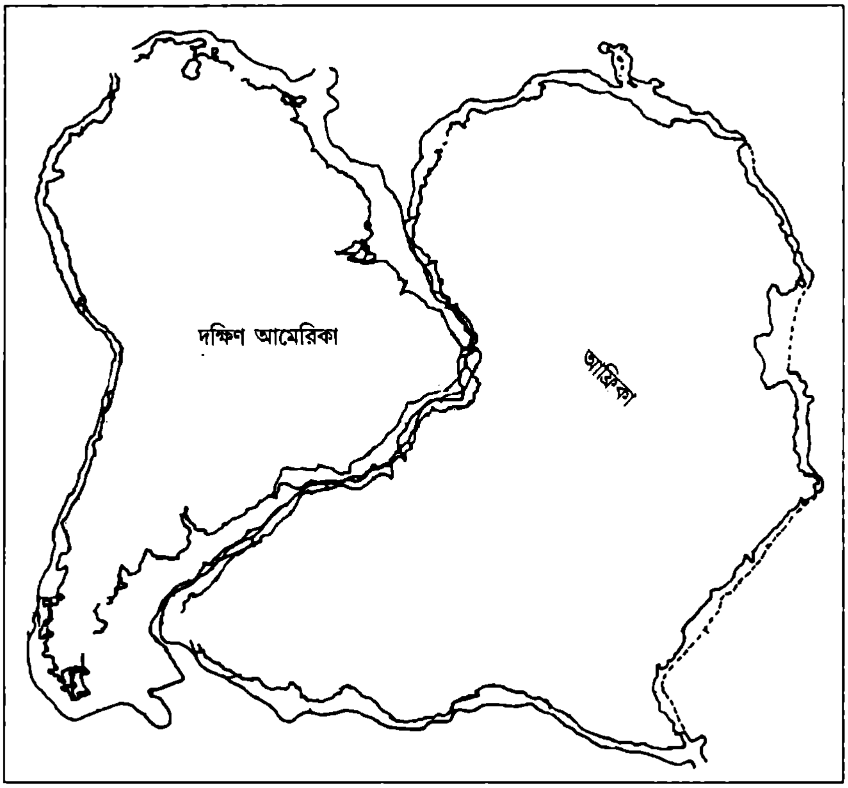

মেলানো যায় দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব সীমানার সঙ্গে আফ্রিকার পশ্চিম সীমানা।

জায়গায় আনলে মিলিয়ে দেওয়া যায়। দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব সীমানার সঙ্গে সুন্দরভাবে মিলে যায় আফ্রিকার পশ্চিম-সীমানা। তাহলে কিন্তু অতলান্তিক মহাসাগরটা থাকবে না। এরকম সমুদ্রগুলোকে ফাঁকা জায়গা ভেবে মহাদেশগুলোকে একজায়গায় আনা যেতে পারে। তাতে হয়তো কোথাও কোথাও সামান্য ফাঁক-ফোঁকর থাকলেও বেশ সুন্দর মেলানো যায়। অনেকটা 'জিগ্‌স পাজ্‌ল'-এর মতন।

শুধু সীমানার চেহারাগুলোর মিল দেখেই যে তাঁরা খুশি হলেন, তা নয়, বরং এক নতুন গবেষণার কাজ তাঁরা শুরু করলেন। দক্ষিণ আমেরিকার পূব সীমানার শিলাস্তরের সঙ্গে আফ্রিকার পশ্চিম সীমানার শিলাস্তরের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যায় কী না? পেলেন। এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন।

নতুন এক ভাবনার কথা জানা গেল। সেটা হল মহাদেশগুলো একজায়গায় দাঁড়িয়ে নেই! তারা চলাফেরা করে! আর এটা মেনে নিলে কিন্তু জীববিজ্ঞানী আর ভূ-বিজ্ঞানীদের সমস্যাটাও মিটে যায়। অবশ্য মেনে নেওয়ার মতো আরও অনেক প্রমাণও তো পাওয়া গেল। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকা আর আফ্রিকার সীমানার মিলটা তো সাঙ্ঘাতিক প্রমাণ। বিজ্ঞানীরা অনেকেই মেনে নিলেন। তবে সবাই একমত হলেন না। এ প্রকল্পটার একটা নাম দেওয়া হল। 'মহীসঞ্চরণ প্রকল্প'।

অনেকে আবার বললেন সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়ার কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠটা বেড়ে যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। নতুন করে সমুদ্রপৃষ্ঠ তৈরি হয়। আর আগেকার অংশটার অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়। এরকমটাই হয়। এও প্রকল্প হিসাবে পাওয়া গেল। নামটা, সমুদ্রপৃষ্ঠ প্রসারণ প্রকল্প।

এসব ঘটনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত হলেন। ঘটনাগুলো আগেও ঘটেছে। এখনও ঘটছে। হয়ত সামান্য কিছু হেরফের হয়েছে। কিন্তু এর কারণ তো জানার দরকার। বিজ্ঞানীরা আবার নানান চিন্তা-ভাবনা শুরু করলেন। এখন তো কারণটা জানাই গেছে। আর এই কারণটা জানতে গিয়েই পাওয়া গেল 'প্লেট টেকটনিক্‌সে'র তত্ত্ব। এ নিয়ে অনেকেরই বেশ কৌতূহল আছে। কারণ এ তত্ত্বের নামটা এখন প্রায় সকলেরই চেনাজানা।

তবে এ তত্ত্বটা জানার পর পৃথিবীর নানান ঘটনা সম্পর্কে একটা সুন্দর ধারণা পাওয়া গেছে। অগ্ন্যুচ্ছ্বাস, ভূ-কম্পন কিংবা পাহাড় তৈরির মতো রোমাঞ্চকর ঘটনাগুলো সহজেই ব্যাখ্যা করা গেছে। অথচ একটা সময় মানুষ এসব নিয়ে কতকিছুই কল্পনা করেছে! সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। সে ধারণাগুলো কতটা ঠিক, তা জানতে গিয়েই তো ধাপে ধাপে পাওয়া গেছে 'প্লেট টেকটনিক্‌সে'র তত্ত্ব। ওই সব ধারণাগুলো এখন আর কেউই বিশ্বাস করে না। তবু এতটা এগিয়ে আসতে ওই ভাবনাগুলোই বাধ্য করেছিল। তাই সেগুলোও জানার দরকার।

এখনও কিন্তু গবেষণা চলছে। 'প্লেট টেকটনিক্‌সে'র ভাবনা নিয়ে। অনেক নতুন ধারণাও পাওয়া যাচ্ছে। তাতে আরও বুঝতে সুবিধা হচ্ছে পৃথিবীর ভেতরের কাণ্ডকারখানা। পৃথিবীর কেন্দ্রের জায়গাটায় নাই বা সশরীরে যাওয়া গেল, বিজ্ঞানীরা তার অনেক রহস্যই জানতে পেরেছেন।

আমাদেরও মনে হয়, আর বেশিদিন পৃথিবী লুকিয়ে রাখতে পারবে না তার গোপন কথা। তার শেষ সন্তানরাই তাকে আবিষ্কার করে ফেলবে।

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে ভারত এশিয়া মহাদেশের উত্তরদিকে এগিয়েছে।

ছবি : জুরান নাথ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

ফেলুমামার বেড়াল

মিয়াওঁ।

ছিল একটা রুমাল হয়ে গেল বেড়াল এমনটা আর কী!

ভদ্রলোক এতক্ষণ চাদরমুড়ি দিয়ে দিব্যি বসেছিল পার্কের চেয়ারে। এক পাশে ফেলুমামা মর্নিংওয়াক সেরে ঘুমিয়ে নিচ্ছেন। আজ একটু কুয়াশা পড়েছে বলে বোধহয় তাঁর সঙ্গীরা কেউ এখনও এসে পৌঁছয়নি। একপাশে ফেলুমামা। আর একপাশে উটকো ভদ্রলোক। গায়ে চাদর মোড়া। মাথায় হনুমান টুপি।

এমনসময় আওয়াজ মিয়াওঁ।

আওয়াজটা আসছে ভদ্রলোকের চাদরের ভেতর থেকে। ছিল চাদর, হয়ে গেল বিড়াল। না, চাদর-চাদরই থাকল তার ভেতর থেকে বিড়াল বেরিয়ে পড়ল।

ভদ্রলোক সন্তর্পণে চাদরের ভেতর থেকে বেড়ালটা বার করলেন।

ফেলুমামা দেখলেন, এক নধরকান্তি সাদা রঙের বেড়ালের বাচ্চা। তার গায়ে হাত বোলাতে-বোলাতে ভদ্রলোক বললেন,—বুঝতে পেরেছি তোর এখন দুধ খাবার সময়।

ফেলুমামা সবিস্ময়ে বেড়ালের বাচ্চাটিকে দেখছিলেন। দুই চোখের মাঝখানে বেড়ালটির কপালে আবার সিঁদুরের টিপ পরানো হয়েছে। গলায় পুঁথির মালা।

ফেলুমামা কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে বললেন,—আপনার পোষা বেড়াল বুঝি? ভদ্রলোক বললেন, হ্যাঁ।

অনেকে কুকুর নিয়ে মর্নিংওয়াক করেন। আমাদের বেঞ্চে এসে বসেন বীরুবাবু। উনিতো একটা বাছুরের মতো সাইজের কুকুর নিয়ে আসেন রোজ।

কী অ্যালসেসিয়ান? ভদ্রলোক বললেন।

না। আমারও ধারণা ছিল। তবে কুকুর সম্পর্কে আমার জ্ঞান যে কত অল্প তা একটু পরেই বুঝতে পারলাম। বীরুবাবু বলেছিলেন, এই কুকুরগুলো নাকি লায়ানেসিয়ান। অ্যালসেসিয়ান মা আর লায়ন মানে খোদ পশুরাজ এর বাবা। এমন কুকুর ওয়ার্ল্ডে এ-পর্যন্ত মাত্র শখানেক তৈরি হয়েছে। এটি তার মধ্যে একটি।

কি ভয়ানক! কামড়ায় না?

ফেলুমামা বললেন,—বীরুবাবুর বক্তব্য, লায়নেসিয়ান কুকুর যাকে-তাকে কামড়ে দাঁত নষ্ট করেনা। আফটার অল ওদের একটা পে-ডিগ্রি আছে।

যাই বলুন মশাই, ভদ্রলোক বললেন,—কুকুরের চেয়ে বেড়াল অনেক ভালো। বেড়াল ভেজিটেরিয়ান, ননভেজ বোথ। আপনি দুধ খাইয়ে রাখুন দুধই খাবে। মাংসের টেংরি দেবার দরকার নেই। আপনি মাছের কাঁটা দেবেন, মাছের কাঁটাই সই। বেড়াল হল দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালক, যাহা পায় তাহা খায়।

ফেলুমামা বললেন,—আমার কাকার একটা বেড়াল ছিল সে কিন্তু যা সামনে পেত তাই খেত। লেপ তোষক, বালিশের ওয়াড় সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য ছিল বাচ্চাদের হোম টাস্কের খাতা।

ভদ্রলোক বললেন,—বেড়াল হলেই হলনা, ওই যে বললেন,—পে-ডিগ্রি, মানে বংশ, সেটাও দেখা চাই। অর্থাৎ কোন বংশের বেড়াল সেটা আগে দেখতে হবে।

ফেলুমামা অবাক হয়ে বললেন,—বেড়ালেরও বংশ আছে নাকি?

আছে মানে? আলবৎ আছে। তিন ধরনের উচ্চবংশের বেড়াল আছে। কাবুল বংশের বেড়াল। তার মানে তাদের ফোর ফাদাররা কাবুল থেকে এসেছিল। ওই যে মহাভারতের গান্ধারী। তিনি তো আফগান মেয়ে। বিয়ের কনে হয়ে যখন ইন্দ্রপ্রস্থ মানে দিল্লিতে এলেন তখন সঙ্গে দু-দুটো কাবুল বেড়াল নিয়ে এসেছিলেন। সেই বিশুদ্ধ কাবুল বেড়াল বংশ পরম্পরায় বেড়ে অথবা কমে এখন হয়েছে মাত্র দশ। বাকি দুটো বিশুদ্ধ প্রজাতির বিড়াল হল জাপানি বিড়াল আর ম্যাদাগাস্কারের বেড়াল। তবে ম্যাদাগাস্কারের বেড়াল লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তবে কিছুদিন আগে সেখানকার বাঙালি অ্যাম্বাসাডার এ. কে. বাসু সেখানকার বিলুপ্ত প্রজাতির দুটো বেড়াল সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এই বেড়াল দম্পতির চারটি ছেলেমেয়ে হয়। অমলবাবু সম্পর্কে আমার মেসো। তিনি আমাকে দুটি বাচ্চা দেন। একটা হুলো আর একটা মাদী। বললে পেত্যয় পাবেননা মশাই ওই বেড়াল যেদিন থেকে আমার বাড়ি এসেছে সেদিন থেকে আমার ভাগ্য ঘুরে গেছে। আমি ভ্যাগাবন্ডের মতো জীবন কাটাতাম। চাল-চুলো ছিলনা। তিসির ব্যবসা করতে গিয়ে দশলাখ লোকসান খেয়েছি। কিন্তু যেই ওই বেড়াল আমার ঘরে এল অমনি আমার তিসির বাজার তেজি হয়ে উঠল।

আগে থাকতাম বেলেঘাটা বস্তিতে। এখন টালায় নতুন বাড়ি করে উঠে এসেছি। দুই ডাক্তারের সঙ্গে দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। প্রতি বছর পুজোর সময় আমরা এখন সিঙ্গাপুর বেড়াতে যাই, আগে লিলুয়ায় যাবারও পয়সা জুটত না।

বলেন কী, খোদা যব দেতা ছপ্পড় ফুঁড়কে দেতা, ফেলুমামা মন্তব্য করলেন।

উহুঁ-হুঁ, ভদ্রলোক আপত্তি জানালেন খোদা নয়, বেড়াল। এই ম্যাদাগাস্কারের হুলো আর মাদীই আমাকে সব দিয়েছে। মেসো আমায় বলেছিলেন ম্যাদাগাস্কারের আদিম অধিবাসিদের মধ্যে বিশ্বাস আছে, বেড়ালকে যদি বাড়িতে রেখে প্রতিদিন শুদ্ধভাবে পুজো করা যায় তখন বেড়াল হয়ে ওঠে কল্পতরু। তার কাছে যা চাহিবে তাহা পাবে?

ফেলুমামা বললেন,—আপনারা বুঝি বেড়াল পুজো করেন? কী ভাবে করেন?

মন্তর-টন্তর বেশি নেই এই পুজোর। শুধু রোজ সকালে কপালে সিঁদুর পরাতে হবে। আর-এক বাটি দুধ খাওয়াতে হবে। আর মা ষষ্ঠীর ঘট পাততে হবে। আফটার অল বেড়াল হল মা ষষ্ঠীর বাহন।

ম্যাদাগাস্কারেও ষষ্ঠীর পুজো হয়?

হয়, তবে অন্যভাবে। ওখানেও এক দেবী আছেন। পর্তুগীজ ভাষায় তার নাম আমি উচ্চারণ করতে পারব না। বড় বিদ্‌ঘুটে নাম। বেড়াল তাঁর বাহন। আমার মেসো এসব গল্প বলেছিলেন। কিন্তু তিনি এসব গল্প বিশ্বাস করতেন না। বেড়ালের কপালে সিঁদুর পরাতেন না। দুধ ও খাওয়াতেন না। তার ফলে মেসোর ভাগ্য ফিরল না। কিন্তু আমি শুদ্ধ মনে সব পালন করলাম বলে আমার ভাগ্য প্রসন্ন হল। ফেলুমামা ভদ্রলোকের কোলের বেড়ালের দিকে নজর দিয়ে বললেন,—অঘটন আজও ঘটে বেশ বোঝা যাচ্ছে। আচ্ছা, এই বেড়াল কী সেই বেড়াল?

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন,—না ইনি সেই আদি বেড়াল নন। ইনি তাঁর গ্রেট গ্র্যান্ড ডটার। নাতনির মেয়ে। কিন্তু একে নিয়ে আপনি রোজ বেড়াতে বেরোন নাকি?

না। শুধু আজই ওকে নিয়ে বেরিয়েছি। কারণ একটা অবশ্য আছে। শুনবেন? ভীষণ ইন্টারেস্টিং।

ফেলুমামা বললেন,—বলুন শুনি।

সেই যে আদি বিড়াল যিনি দশ বছর আগে দেহ রেখেছেন। তিনি চারটি বাচ্চা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রত্যেকটি বাচ্চা আমি আত্মীয় স্বজন যাদের দিয়েছি তাদেরই ভাগ্য ফিরে গেছে। আমি শুধু প্রথম বাচ্চাটিকে রেখেছিলাম। সেই বাচ্চা বড় হয়ে মা হয়েছে। তার ছটি বাচ্চা হয়েছে। এবারও প্রথম বাচ্চাকে রেখে আমি বাকিদের বন্ধুবান্ধবদের দিয়ে দিয়েছি। তাদেরও প্রত্যেকের বাড় বাড়ন্ত হয়েছে। সেই প্রথম বাচ্চা যে আমার কাছে আছে তার চারটি বাচ্চা হয়েছে মাস চারেক আগে। কিন্তু বাচ্চা নেবার জন্যে চারিদিক থেকে এত দাবিদার আসছে যে কাকে রেখে কাকে ফেলব, তা ঠিক করতে পারিনি। ধরুন চারটে মাত্র বাচ্চা একটা আমরা রাখব। দুটো আমার দুই মেয়ে নিয়েছে। থাকল একটা। সেই একটা বাচ্চার জন্য পনেরো জন দাবিদার। এমনকী স্থানীয় বিধায়কও লোক মারফৎ খবর পাঠিয়েছেন বাচ্চাটি আমায় দিন। আমি রুলিং পার্টির বিধায়ক হয়েও কিছুতে মন্ত্রী হতে পারছিনা। ওই বাচ্চাটি পেলে হয়তো আমার ভাগ্য প্রসন্ন হতে পারে। ফেলুমামার খুব ইচ্ছে হল। আহা তিনি যদি একটা বাচ্চা পেতেন। কিন্তু একটা মাত্র বাচ্চা। কাকেই বা উনি দেবেন। ফেলুমামা বললেন,—বেশি বাচ্চা থাকলে আমি একটা চাইতাম। আপনাকে বলতে বাধা নেই, এই বয়সে আমার ভাগ্য ফেরাবার কোন দরকার নেই। তবে ব্যাপারটা কী জানেন, যা করতে যাচ্ছি সব গুবলেট হয়ে যাচ্ছে। এতে খুব অপদস্থ হচ্ছি। একটা বেড়ালের বাচ্চা থাকলে হয়তো এই সব বাধাবিঘ্ন কাটত। তাছাড়া আমার এক আদরের ভাগ্নে আছে ঘোঁতন। সে এবার গ্রাজুয়েট হয়ে চাটার্ডে ঢুকবে ঠিক করেছে। ঢোকা বললেই তো আর ঢোকা নয়। বেড়ালটা থাকলে তাকে একটু ছুঁইয়ে দিতাম, তার লাক ফেভার করত।

ভদ্রলোক বললেন,—আপনি নেবেন এই বাচ্চাটা? অবশ্য এখন আর বাচ্চা বলবেন না, ছ'মাস বয়স হয়ে গিয়েছে। আপনি নিলে আমি আর কাউকে দেবনা। আপনাকে কেউ চিনবেও না। তবে একটা শর্ত, কাউকে বলতে পারবেন না কোথা থেকে পেয়েছেন। পয়মন্ত বেড়ালের বংশধর। ওর রক্তে বইছে সেই আদি বিড়াল যে নাকি ছিল মা ষষ্ঠীর সাক্ষাৎ বাহন।

কিন্তু এইযে বললেন,—আপনি কোন বিধায়ক কে দেবার জন্য বাচ্চাটা নিয়ে যাচ্ছেন।

না মশাই তাকে দেব না বলেই বাচ্চাটিকে সব সময় চোখে-চোখে রাখার জন্য সঙ্গে করে ঘুরছি। বিধায়ক মশাই যদি লোক দিয়ে চুরি করে নিয়ে যান একে।

ওঁকে দিচ্ছেন না কেন?

কেন দেব বলতে পারেন? উনি আজ এখানে কাল ওখানে, এ বেড়ালের মান মর্যাদা রাখা তাঁর কম্মো নয়। মধ্যে পড়ে মা ষষ্ঠীর অসম্মান হবে। তার চেয়ে আমি এমন লোককে দেব যিনি সত্যিকারের বিড়াল প্রেমিক—ক্যাটলাভার। যেমন আপনি। ফেলুমামা বললেন আমি যে একজন বিড়াল প্রেমিক তা কী ভাবে জানলেন? ও আমি মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আপনাকে দেখেই বুঝতে পেরেছি, আপনি বেড়াল খুব ভালবাসেন। আচ্ছা একটা পরীক্ষা করা যাক। শেলী মানে আমার বেড়ালটি কে আপনার কোলে বসিয়ে দি। দেখি ও কী রকম আচরণ করে। ও আবার সবার কোলে যেতে চায় না। বিধায়কের বাড়ি যেতে হবে শুনেই ও একদিন খাওয়া বাদ করেছিল। তার পর অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে খাইয়েছি।

এই বলে ভদ্রলোক বেড়ালটাকে ফেলুমামার কোলে দিলেন।

হাত দিন, হাত দিন, গায়ে হাত দিন।

অ্যায়। এবার একটু চুমু খান।

ফেলুমামা দেখলেন বেড়ালটা তার কোলে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। মুখের কাছে মুখ নিয়ে যেতেই বোটকা গন্ধ নাকে এল। মুখটা সরিয়ে আবার বেড়ালটাকে কোলে নিয়ে বসলেন।

দুর্দান্ত মশাই। পোষ মেনেছে। মানে আপনাকে পছন্দ হয়েছে। মা ষষ্ঠী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন। তাহলে বেড়ালটা আপনার কাছেই থাকল।

আমার কাছে? আমি রাখতে পারব তো? আলবাৎ পারবেন। বেড়াল তো আর ছাগল গরু নয় যে গোয়াল ঘর করে দিতে হবে। আপনার কোলে শুয়েই ওর জীবন কেটে যাবে। বিছানায় নিয়ে শোবেন। ওর খাদ্য বলতে দিনে এক লিটার দুধ। গোয়ালার দুধ যেন না হয়, মাদার ডেয়ারির দুধ দেবেন। মাছ রোজ খান তো? হ্যাঁ, গিন্নির আবার রোজ মাছ ছাড়া চলে না। আড়াইশ মাছ এক্সট্রা আনবেন। রুই বা গলদা চিংড়ি আনতে হবে তার কোনও মানে নেই। এনি ফিশ উইল ডু। ইলিশ হলেও চলবে। তবে যদি পদ্মার ইলিশ হয়। নয়তো পুঁটি মাছ দেবেন। ও ভেরি লাকি ম্যান। কনগ্রাচুলেশন। ফেলুমামা বললেন,—আপনার কাছে বড় কৃতজ্ঞ থাকলাম স্যার। এত লোকের উপকার করি, সবাই বাঁশ দেয়। আপনি উপকার না-পেয়েই আমায় বেড়াল দিলেন। আপনাকে কি কিছু দিতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন,—আমি বেড়ালের ব্যবসা করেই কোটিপতি হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি এক পয়সাও চাইনা। তবে মা ষষ্ঠীর পুজোর জন্য কিছু দিতে চান দেবেন?

ফেলুমামা পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করলেন। ভেবেছিলেন একশ টাকার নোট পাবেন। পেলেন না। দুটো পাঁচশ টাকার নোট । এর কাছে কী চেঞ্জ চাওয়া যায়? পুরো পাঁচশ টাকা দিয়ে বেড়ালটি নিয়ে চললেন ফেলুমামা।

চাদরের নিচে লুকিয়ে যে ভাবে ভদ্রলোক নিয়ে এসেছিলেন। কারন তিনি বলে দিয়ে ছিলেন, কেউ যেন না দেখতে পায়। দেখলে সাত সকালে বিড়াল ডাকাতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম নয়। বেড়াল দেখে মামিমার ভিরমি খাবার যোগাড়। বলি তোমার কী কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই? সাত সকালে কোথা থেকে একটা বেড়াল ধরে নিয়ে এলে?

ফেলুমামা বললেন,—এ যে-সে বেড়াল নয় গিন্নি। ম্যাদাগাস্কারের বেড়াল। ভীষণ পয়মন্ত। দ্যাখোনা, এবার আর আমাদের কোনও দুঃখ থাকবে না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় যা চাইবে পাবে।

কী বললে ম্যাদানস্করের বেড়াল? কোথায় সেই ম্যাদানস্কর? একবার ঠিকানাটা দাও। সাতসকালে বেড়াল গছানো বার করে দিচ্ছি।

আঃ ম্যাদানস্কর নয়—ম্যাদাগাস্কার। সে এক অদ্ভুত দ্বীপ। সে দেশে একমাত্র পয়মন্ত বেড়াল জন্মায়। একে একদম অবহেলা করবে না।

এই বলে ফেলুমামা বেড়াল মাহাত্ম্য বর্ণনা করতেই মামিমা একটু শান্ত হলেন। বললেন,—হ্যাঁগা আমার বাতের ব্যথাটা সারবে তো?

শুধু কী তোমার বাতের ব্যথা, তোমার যত রোগ বালাই আছে সব সেরে যাবে। শেষ বয়সে পায়ের ওপর পা তুলে জীবন কাটাবে।

যাই বলো টাকা হলে আমরা ফ্ল্যাট কিনে অন্য কোথাও চলে যাব। এ পাড়াটা সুবিধের নয়। চুরি ডাকাতি লেগেই আছে।

যাব-যাব। বেড়ালের ভাগ্যে এবার শিকে ছিঁড়বেই। কিন্তু খবরদার বেড়াল মাহাত্ম্য কিন্তু

কাউকে বলবে না। এর ওপর সেই বিধায়কের লোক চারিদিকে গরু খোঁজা করে বিড়াল খুঁজছে।

ফেলুমামা তাড়াতাড়ি বাজারে ছুটলেন দুধ আর মাছ কেনার জন্য। প্রথমে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ছিল বেড়ালটা। তারপর দুধ আর মাছ খেয়ে চাঙ্গা হল। বেশ বোঝা গেল যে অনেক দিন পেটপুরে কিছু খায়নি।

এমনি দুদিন কেটে যাবার পর নিজমূর্তি ধরল সেই বেড়াল।

রান্নাঘরে মাছ ভাজা রেখে মামিমা ঠাকুর ঘরে ঢুকেছিলেন। ফিরে এসে দেখেন সব মাছ উধাও। উঁকি মেরে দেখেন, বেশ কটি মাছ ভাজা খাটের নিচেয় রেখে মনের সুখে শেলী সেগুলো চিবোচ্ছে। শুধু তাই নয়, তার পর দিন বেড়ালকে চব্য-চোষ্য খাইয়ে খেতে বসেছেন ফেলুমামা। বাজার থেকে গোটা রুই মাছ কিনেছেন। শেলীকে দুটো পেটির মাছ খাইয়ে মুড়োটা ফেলুমামার পাতে দিয়েছেন, অমনি শেলী কোথা থেকে এসে মাছের বাটিতে মুখ লাগিয়ে মাছের মুড়োটা খেতে গেল।

ফেলুমামা বুঝতে পারলেন না কী করবেন। মামিমা হেট-হেট করে তাড়াতে গিয়েছিলেন, ফেলুমামা বাধা দিলেন। থাক-থাক মা ষষ্ঠীর ইচ্ছে হয়েছে মাছের মুড়ো খাবেন, তুমি বাঁধা দিও না। মাছের মুড়োটা তুলে শেলীর মুখের সামনে ধরলেন ফেলুমামা। শেলী কোনওদিকে না তাকিয়ে মাছের মুড়ো খেতে লাগল।

এমনি করে কদিন গেল। এর মধ্যে শেলী চারদিন রান্না ঘরে ঢুকে দুধে মুখ দিয়েছে। মশারির একটা অংশ চিবিয়ে কেটে দিয়েছে। রাত্তির বেলা হুটোপুটির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল মামিমার। ফেলুমামাকে বললেন,—এই দ্যাখ তো চোর-টোর ঢুকল কিনা। চোর? কোথায় চোর? ফেলুমামা বলে উঠলেন।

ওই যে রান্না ঘর থেকে হুটোপুটির আওয়াজ আসছে। মনে হচ্ছে, আবার চোর এসে সব বোধহয় চুরি করে নিয়ে গেল।

ফেলুমামা বললেন,—যদি চোর না-হয় তাহলে দেখার কোনও দরকার নেই। যদি চোর হয় এখন তার সামনে যাওয়াটা বিপদজনক। চোরেরা চুরি করার সময় কোনও সাক্ষী রাখতে চায়না। ছোরা-চাকু চালাতে পারে। তার চেয়ে চোরকে আগে পালাতে দাও। তখন বুদ্ধি বাড়বে।

কী করা যায় তখন ঠিক করা যাবে।

মামিমা বললেন,—ধুত্তোর নিকুচি করেছে। আমি নিজেই দেখছি। এই আমার দিব্যি রইল আর যদি কোন দিন তোমায় বলেছি।

মামিমা নিজেই টর্চ হাতে করে দরজা খুলে রান্না ঘরে ঢুকলেন। খুট করে আলো জ্বালতেই তাঁর যা চোখে পড়ল তা দেখে চক্ষু ছানাবড়া। শেলী ছুটাছুটি করছে, তাকে তাড়া করছে একটা লম্বা ধেড়ে ইদুঁর। এতদিন বেড়ালরাই ইদুঁর তাড়া করত। এখন ইদুঁরই বেড়াল তাড়া করছে।

মশারি কেটে খাওয়ার পর শেলীকে আর কাছে নিয়ে শুতে ভরসা হয়নি ফেলুমামার। রান্না ঘরে তার শোবার জায়গা করেছিলেন। রাত দুপুরে ইদুঁরের উৎপাতে শেলী কৌটো, বাসনের ওপর দিয়ে প্রাণপনে ছুটছে আর ঝনঝন আওয়াজ হচ্ছে। বাসন-কোশন উলটে পড়ার শব্দ। মামিমাকে দেখে শেলী ডেকে উঠল, মিয়াওঁ।

পরদিন ভোর হতেই মামি সুটকেশ গোছাতে লাগলেন। ফেলুমামা অবাক হয়ে বললেন,—একী এই ভোরে কোথায় যাচ্ছ ?

মামিমা বললেন,—বাপের বাড়ি। এই বাড়িতে তুমি বেড়াল নিয়ে থাকো। আমি চললাম। আহা করছ কী? সবই মা ষষ্ঠীর পরীক্ষা। উনি আমাদের ধৈর্য পরীক্ষা করছেন।

তোমার পরীক্ষা তুমি দাও, আমি এর মধ্যে নেই। এই নিয়ে বচসা। অনেকক্ষণ পর মামিমা গৃহত্যাগ স্থগিত রাখলেন। শর্ত বেড়ালকে এখনই কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে।

অগত্যা একটা থলির মধ্যে বেড়াল ভরে ফেলুমামা একটা নিরুপোদ্রব জায়গা খুঁজতে বেরুলেন। ভাবলেন, গঙ্গার দিকে কোথাও ছেড়ে দেবেন। কাছাকাছি ছাড়লে আবার তো সেই বাড়িতেই ফিরে আসবে।

ফেলুমামা অবশেষে গঙ্গা যাত্রায় চললেন। কাশীপুরের রাস্তা ধরে গঙ্গার দিকে। কিন্তু পথ তো কম দূর নয়। যাচ্ছেন তো যাচ্ছেনই। ডান কাঁধে একটি ঝোলা। ঝোলার ভেতর বেড়াল। ওপরটা চেন দিয়ে আটকানো।

যেতে-যেতে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে গেলেন ফেলুমামা। হঠাৎ চোখ পড়ল একটি দোতলা বাড়ি। গেটের সামনে লেখা পতিতপাবন পতিতুণ্ডি এম.এল.এ।

আরে এটাই তো তাদের এলাকার বিধায়কের বাড়ি।

ফেলুমামার মনে পড়ল, পার্কের ভদ্রলোক এই বিধায়কের কথাই বলেছিলেন। তিনি নাকি এই বেড়ালটা নিতে চেয়েছিলেন।

তিনি ভাবলেন তাহলে এই বিধায়কের কাছেই বিড়ালটা গছানো যাক। তিনি যখন এর জন্য এত আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন। বিধায়কের বাড়ির কাছাকাছি এসে ঝোলা থেকে বেড়ালটা বার করতে যেতেই হঠাৎ হল কী বেড়ালটা ঝোলা থেকে বেরিয়ে পড়েই ফেলুমামার নাগাল এড়িয়ে এক ছুট লাগাল।

ধর-ধর করে ফেলুমামাও বেড়ালের পিছনে ছুটলেন। কারণ বিধায়ককে বেড়াল ঘুষ দিয়ে তাঁকে হাতে রাখার সুবর্ণ সুযোগ ছাড়তে তিনি রাজি নন। কিন্তু হাতের বিড়াল হাত ছাড়া হয়ে গেল। না চলবে না। ফেলুমামা তাই বেড়াল ধরতে পিছু-পিছু ছুটলেন।

ব৲ রাস্তা গলি পার হয়ে বেড়ালটা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ফেলুমামা মরিয়া হয়ে সেই বাড়িতে কড়া নাড়লেন।

দরজা যে খুলে দিল তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন ফেলুমামা।

সেদিন পার্কে দেখা হওয়া সেই ভদ্রলোক। যে ৫০০ টাকা নিয়ে বেড়ালটা তাঁকে গছিয়ে ছিল। লোকটির কোলে শেলী সেই বেড়াল। ফেলুমামাকে দেখে ভদ্রলোক থতমতো খেয়ে গেলেন।

আপনি?

ফেলুমামার তখন বুদ্ধি ফিরে এসেছে। তিনি বললেন,—ভেবেছিলেন, ধাপ্পা দিয়ে পাঁচশো টাকা নিয়ে পার পাবেন তাই না? আমার পিছনে পিছনে পুলিশ আসছে। এখনই আমার টাকা ফেরৎ দিন। আপনার বেড়ালতো আগেই ফেরৎ পেয়েছেন।

ভদ্রলোক থতমতো খেয়ে বললেন,—আমি মাপ চাইছি স্যার। একটু দাঁড়ান, আপনার পাঁচশ টাকা এনে দিচ্ছি। আসলে এই বেড়ালটা এমন অতিষ্ট করে তুলেছিল যে আমার গিন্নি বলে দিয়েছিলেন, হয় বেড়াল, না-হয় তিনি। আমি তাই সাত সকালে বেড়াল নিয়ে বেরিয়ে ছিলাম তারপর আপনাকে গছাতে পেরে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। এর আগে তিন তিন বার এমন গছিয়ে ছিলাম। কিন্তু সব জায়গা থেকে পালিয়ে আবার আমার বাড়ি চলে এসেছে। শেষে আপনাকে দিয়ে চার বার হল। সত্যি-সত্যি পুলিশ আসছে নাকি স্যার। এলে ওদের একটু বুঝিয়ে বলবেন।

ছবি ঃ জুরান নাথ

দেবাঞ্জন চক্রবর্তী

জন্মান্তর

আমি তো ভাবছিলাম আপনারা আর আসবেনই না। সিদ্ধ আলুর খোসা ছাড়িয়ে চটকাতে চটকাতে বলল অনিলদা। অনিলদা মানে অনিল সরকার। মাথায় চারফুট এগার ইঞ্চি। কালো কোঁকড়া ঘন চুল সব সময় মুখে হাসি। অনিলদা বাবার অর্ডারলি পিয়ন। সাদা বাংলায় যাকে বলে আর্দালি।

কেন? মা জিজ্ঞাসা করলেন—আসব না কেন?

বাবুর শুনলাম কলকাতায় বদলী হয়েছে। আপনারা তো কলকাতাতেই ছিলেন, সেখানে কিছু শোনেননি?

বাটি থেকে ভাজা সোনামুখ ডাল ধোঁয়া ছড়াচ্ছিল, সঙ্গে সুবাসও। আজ ঢেকীছাঁটা চালটা রান্না হয়েছে। এ চালের ভাত দেখতে লাল-লাল মোটা হলেও এর স্বাদ চমৎকার। আর আছে আলু সিদ্ধ আর কড়া করে ভাজা পেঁয়াজি। উঠোনের নারকেলী লঙ্কাগাছটায় নতুন ফল ধরেছে। থালায় একটা করে টাটকা লঙ্কা। ভাতের মধ্যে বিশুদ্ধ গব্য ঘৃত। থালার কোণের দিকে লবন।

রাতের ট্রেনে ঘুমতে পারেনি ছোটকু। কুয়োর জল তুলে চৌবাচ্চা ভর্তি করে রেখে গেছে হারুর মা। ঠান্ডা জলে স্নান করে গা জুড়িয়ে গেল। গামছায় গা মুছে চুল আঁচড়াতে-আঁচড়াতে খাদ্যের ঘ্রাণ পাচ্ছিল ছোটকু। আর তার খিদেটা বেড়ে যাচ্ছিল হু-হু করে।

এবার কলকাতায় গিয়ে অনেকদিন থাকতে হয়েছে ছোটকুদের। শেষে তার মালদার জন্য মন খারাপ লাগছিল। কতদিন স্কুল হয়নি। মার একটা অপারেশন হবার কথা ছিল তিন মাস আগে। অবনীদাদুর কথায় সেটা পিছিয়ে দিতে হয়েছিল।

অবনীদাদু ছোটকুদের আত্মীয়দের মধ্যে কেউ নয়। তবে আত্মীয়র মতো। অবনীদাদু চোখে একটুও দেখতে পায়না, একদম অন্ধ। অবনীদাদুর নাকি আশ্চর্য ক্ষমতা। মানুষের ভবিষ্যৎ বলে দিতে পরে। আচ্ছা, মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীর, কোনও জানোয়ারের ভবিষ্যৎ হয়না? তাহলে কেউ তা বলে না কেন? স্কুলের পাশে নদীর ধারে বটগাছটার নিচে যে হাতিটা গাছটার সঙ্গে বাঁধা থাকে— ছোটকুর তার ভবিষ্যৎ জানতে ইচ্ছে করে।

কলকাতার মামাবাড়িতে গণমামার শোবার ঘরে অবনীদাদু জমিয়ে গল্প করছিল। মা গিয়ে শুধু প্রণামটা করেছে। অন্ধ মানুষ-চোখে দেখে না। জিজ্ঞাসা করছে, কে? কে? তারপর নিজেই বলছে—কে মালতী নাকি?

ছোটকুর খুব অবাক লাগে। কিভাবে প্রণামের সময় মুহূর্তের স্পর্শের মধ্যে দিয়ে অবনীদাদু বুঝে ফেলল ওটা মালতী, তার মা। আরও অবাক হওয়া বাকি ছিল। মার অপারেশনের কথাটা কাউকেই জানানো হয়নি। এমনকি ছোটকু নিজেও তখন জানত না। অবনীদাদু মাকে বলল,—মালতী, তোমার কি কাঁটাছেড়া হবার কথা? কয়েকদিনের মধ্যে?

মা কেমন আপাদমস্তক কেঁপে উঠল। গণমামাও বেশ অবাক। যদি দুদিনের মধ্যে অপারেশনটা করাতে পার তাহলে ঠিক আছে। না-হলে, আগামী তিনমাসের মধ্যে করতে যেও না। বৈশাখ পড়লে তারপর ওটা করবে। না-হলে তোমার বিপদ হতে পারে। বলে অবনীদাদু সেই যে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল আর কোনও ভাবেই তার মুখ দিয়ে এ বিষয়ে কোনও কথা বের করা গেলনা।

দুদিনের মধ্যে অপারেশনের ব্যবস্থা করা গেল না। বাবা গভমেন্টের চাকরি করে। ছোটকু গভমেন্টকে দেখেনি। ভাসা-ভাসা ভাবে সে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করে। অনিলদা যখন তার সঙ্গে বেড়াতে যায় অন্য কারও সঙ্গে দেখা হলে বলে,—এটা সাহেবের ছেলে। ছোটকুর খটকা লাগে। তার বাবা কি করে সাহেব হয়। সাহেবরা তো কবে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। তাহলে সে কি করে সাহেবের ছেলে হয়।

বাবা সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ পায়। শীতকাল অপারেশনের ঋতু। এ সময়ে কাটাছেঁড়া করলে কষ্ট কম হয়।

ছোটকুরা কলকাতায় গিয়েছিল মাসখানেকের হিসাব করে। পাক্কা চারমাস থাকতে হল। মামাবাড়ির ঘর বেশি নেই। সকলেরই কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। মুখে অবশ্য কেউই কিছু বলেনি, মানিয়ে নিয়েছে।

অবনীদাদুর ওরকম কথার পর কেউই ঝুঁকি নিতে চায়নি। মানুষটি জন্মান্ধ, কিন্তু আশ্চর্য, এইভাবে আচমকা যখন যে কথা তিনি বলেছেন সেগুলোর প্রায় সবই নাকি অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেছে। বাবা নিজে এইসব একদমই বিশ্বাস করেনা। বুজরুকি, গাঁজাখুরি বলে আগ্রাহ্য করে। সেই বাবাই নিজের বউ-এর চিকিৎসার সময় ঝুঁকি নিল না। চিন্তায় পড়ে গেল।

বারান্দায় পরপর তিনটে পিঁড়ি সার দিয়ে পাতা। বড় কাঁসার থালায় যত্ন করে রাখা লাল চালের ভাত, ঘি, আলুসিদ্ধ, পেঁয়াজি। বাটিতে রাখা ভাজা সোনামুগ ডাল ছোটকুকে ডাক দিচ্ছিল। শুধু ঘি লবন দিয়ে ভাত খেতে খুব ভালবাসে ছোটকু। ঘি দিয়ে মেখে ভাতের প্রথম দলাটাকে লবনের টিপ মাখিয়ে।

মুখস্থ করার পর গলা দিয়ে নেমে যাচ্ছিল অমৃতস্বাদ।

বাবা অনিলদাকে বলল,—তোকে কে বলল, আমার বদলী হয়েছে?

অনিলদা মেয়েদের মতো মুখ টিপে হাসল। বাবু বুঝি কিছুই জানেনা।

ছোটকুর জন্মেরও আগে থেকে অনিলদা

এই বাড়িতে আছে। খুব ছোট থাকতেই অনিলের বাবা-মা মরে গেছে। তার তিনকূলে কেউ নেই। অন্তত যারা আছে তাদের কেউ ওর কোনও দায়িত্ব নিতে চায়নি। অনিলদা বাবার বিয়ের আগে থেকে বাবার সঙ্গে আছে। বাবাকে বাবু আর মাকে মা বলে ডাকে। মাকে মা বলে ডাকাটা ছোটকু পছন্দ করে না। মা শুধু তার মা।

এগারটা সাড়ে এগারটা নাগাদ অনিলদা বাবার অফিসে যায়। সেখানে সে কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে সই করে,—অনিল সরকার, ছোটকু জানে অনিলদা আর কিছুই লিখতে জানে না—শুধু বাংলায় নিজের নামটা সই করতে পারে

সাদা হাফসার্ট আর সাদা হাফপ্যান্ট পরে অনিলদা অফিস যায়। এখনও তাকে ফুলপ্যান্ট পরানো যায়নি। রোদের মধ্যে মাথায় ছাতা ধরে অনিলদার অফিস যাওয়া দেখতে মজালাগে ছোটকুর। সে এখন অনিলদার কাঁধের সমান লম্বা। তিন চার দিন পরপরই ছোটকু চেঁচায়—অনিলদা তোমার সমান লম্বা হয়ে গেছি।

অনিল হাসে। বলে,—আমি তো বেঁটে। আমার চাইতে তুই অনেক বেশি লম্বা হবি। তুই বাবুকেও ছাড়িয়ে যাবি।

জিতেনবাবু বলেছিলেন। পরশুদিনও তিনি বললেন অনিল তোমার সাহেব তো এবার চলল। তার তো প্রমোশন হয়েছে। তা তুমি কি তার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতায় যাবা—নাকি আমার কাছে আসবা? বাবার ভুরুটা কুঁচকে গেল। জিতেন বলছে! সে তো বাজে কথা একদমই বলেনা। তাহলে তো ঘটনাটা সত্যি!

—কোথায় প্রমোশন হয়েছে বলেছে? আর কিছু বলেছে?

—আজ্ঞে, যাদবপুর না কোথায় আপনার পোস্টিং হয়েছে বলেছে। এই অফিস থেকে শুধু আপনারই নাকি প্রমোশন হয়েছে। অন্যদের তো সব মুখ ভার।

খাওয়া বাবার মাথায় উঠল; কোনওমতে নাকেমুখে দুটো গুঁজে পংখিরাজ বার করে একলাফে বাবা তার ওপর চড়ে বসল।

মা-বাবার সাইকেলটার নাম দিয়েছে পংখিরাজ। অনেকদূর থেকে এটার আওয়াজ টের পাওয়া যায়। প্যাডেলটা মাঝে-মাঝেই খারাপ হয় আর ঘটাং-ঘটাং আওয়াজ করে। বাবা সাইকেল আর জিপে চড়ে। চাকরির প্রথমদিকে উত্তরবঙ্গে বদলীর আদেশ পেয়ে নীতিশ চন্দের মনে হয়েছিল—নির্বাসন। তিনি শুনেছিলেন গঙ্গার ওপারে সবকিছু অন্যরকম। হাওয়া আলাদা, মানুষও।

ক্রমে নীতিশ চক্রবর্তী বুঝতে পারেন—বিষয়টা সত্যি। তারমত ছোটখাটো সৎ আফিসারদের পক্ষে কলকাতা এবং আশপাশের এলাকার চাইতে উত্তরবাংলা অনেক বেশি সুবিধাজনক। এখানে মানুষ মাটি ছুঁয়ে আছে। এখনও মানসম্মান হারিয়ে ফেলেনি। সূক্ষ্ম বোধগুলো সব স্থুল হয়ে যায়নি। সততা মূল্যবোধ—এসব শব্দের মানে এখানে বোঝা যায়।

উত্তরবঙ্গের একজেলা থেকে অন্য জেলায় বদলী হয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল নীতিশ চন্দের। ছোটকু তার জন্মের সময় মাত্র কয়েকটা দিন কলকাতায় ছিল। তারপর থেকেই সে উত্তরবাংলায়।

মালদার ক্ষুদিরাম বিদ্যামন্দিরে প্রাইমারি সেকশনে ছেলেমেয়েরা সবাই একসঙ্গে পড়ে। ক্লাস ওয়ান আর দু-দুবছরই ছোটকু ফার্স্ট হয়েছে। সব বিষয়ে ফুল মার্কস পেয়ে ফার্স্ট হওয়া স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। ক্লাস থ্রির ইয়ারলি পর্যন্ত অবস্থাটা এরকমই ছিল। অ্যানুয়ালে হঠাৎ বদলে গেছে।

তার পাড়ার মিলনময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের দিদিমনি লীলা দিদিমনির কাছে ছোটকু রাতে প্রাইভেট পড়ে। এখনও সব বাড়িতে ইলেকট্রিক লাগেনি। দিদিমনির বাড়ি থেকে ছোটকুদের বাড়ি অনেকটা পথ। বিরাট একটা মাঠ পার হতে হয়। সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই মাঠে লোক ভর্তি থাকে, কতরকম খেলা হয়। রাতে মাঠটা ফাঁকা হয়ে যায়। ছোটকুর পড়া শেষ হয়ে যখন ঘুম পেতে থাকে তখন দেখা যায় অনিলদা কোনওদিন হাতে টর্চ, কোনওদিন লণ্ঠন নিয়ে লীলা দিদিমনির বাড়িতে ঢুকছে।

বইপত্র গোছানোই থাকে। বেঁটে হলে কি হবে অনিলদা খুব জোরে হাঁটতে পারে। ছোটকুকে তাল রাখতে প্রায় ছুটতে হয়। সে যত তাড়াতাড়ি হাঁটে অনিলদা তার চাইতে আরও একটু জোরে হাঁটে। মাঝে-মাঝে দুহাতে তালি বাজায়। বলে,—পোকামাকড় আর লতারা রাস্তা থেকে সরে যাবে। সাপকে রাতে আনিলদা কিছুতেই সাপ বলে না, লতা বলে। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া বড় গাছগুলো হাল্কা অন্ধকারে ভুতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। ছোটকুর বেশ ভয় করে। সে মনে-মনে বিড়বিড় করে—রাম-রাম রাম-রাম।

লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার নাচাতে-নাচাতে অনিলদা সামনে-সামনে হাঁটে। এত বড় মাঠের মধ্যে লণ্ঠনটার খুব অল্পই আলো হয়। টর্চে আরও কম। বাড়ির কাছে এসে ছোটকু একছুটে বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

থ্রির অ্যানুয়ালে ছোটকু প্রথম হয়নি। পরীক্ষার মাস তিনেক আগে নতুন আসা একটা মেয়ে—শ্রাবণী সেন-তার চাইতে এক নম্বর বেশি পেয়ে প্রথম হয়। শ্রাবণীর হাতের লেখা খুব সুন্দর। তার খাতায় কোনো কাটাকাটি নেই।

একটা নম্বর কম পেয়ে ছোটকুর খুব কষ্ট হয়েছিল। সে সেকেন্ড হওয়ায় বাবাও কম আশ্চর্য হয়নি। জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—তা ফার্স্ট কে হয়েছে?

—শ্রাবণী।

—শ্রাবণী কে? আগে তো কোনওদিন নাম শুনিনি।

—শ্রাবণী সেন। ওই যে যেমেয়েটা নতুন এসেছে। তিনমাস আগে। বাবা তাকে ভালো করে দেখল। তারপর বলল,—ছি-ছি তোর লজ্জা করে না। একটা মেয়ে ফার্স্ট হয়ে গেল, তোকে হারিয়ে দিয়ে ছি-ছি।

ছোটকুর খুব দুঃখ হয়েছিল। বাবার কথা শুনে তার লজ্জা করতে লাগল।

তারপর থেকে শ্রবণীকে দেখলেই ছোটকু লজ্জা পায়। এই মেয়েটা তাকে লেখাপাড়ায় হারিয়ে দিয়েছে। শ্রাবণী গান জানে, নাচ শেখে, ভালো ছবি আঁকে। ছবি আঁকা ছোটকুর বিশেষ আসে না। ঘোড়া আঁকতে গেলেই সেগুলো কেমন শেয়াল হয়ে যায়। সে সিনারি আঁকতে পারে। চোখা চোখা ত্রিভুজের মতো পাহাড়। দুই পাহাড়ের চূড়ার ফাঁক দিয়ে টকটকে লাল রঙের সূর্য উঠছে। সামনে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদী। গাছ আর সাইকেল বেশ ভালো আঁকে ছোটকু। শ্রাবণী সব কিছুই ভালো আঁকে।

ক্রমে তার জেদ চেপে যাচ্ছিল। এবার হাফইয়ারলি কি অ্যানুয়ালি-সব পরীক্ষাতেই সে শ্রাবনীকে হারাতে চায়। ক্লাশে কোনও স্যার কি দিদিমনি যখন ছোটকুর প্রশংসা করেন সে চট করে একবার শ্রাবণীর মুখটা দেখে নেয়। শ্রাবণী হাসে। হাসলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। আজও স্কুলে যাওয়া হল না ছোটকুর। প্রাইমারি সেকশনের ক্লাশ সকালে হয়। আজ সকালে তখনও তারা বাড়ি এসে পৌঁছয়নি। দুপুরে বাবা অফিস যাওয়ার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে এল। মাকে বলল,—অনিলের খবরটা সত্যি। এবার এখানের পাততাড়ি গোটাতে হবে। এই প্রমোশনটা রিফিউজ করলেও বদলী করে দিতে পারে। আর এটা না নেবারও কোনও মানে হয়না। অনেকগুলো টাকা মাইনেও বাড়বে।

বিকালের মধ্যে খবর ছড়িয়ে গেল। ছোটকুরা চলে যাচ্ছে। চারদিকে বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। ছোটকুর খেলার বন্ধুরা দল বেঁধে এল। তাদের চোখে মুখে অবিশ্বাস, সংশয়। সত্যি তোরা চলে যাবি ছোটকু? উত্তরে সে কিছু বলছিল না। বন্ধুদের ক্রমশ হতাশ দেখাচ্ছিল। কে তাদের নতুন বল খেলতে ডাকবে, নতুন ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে আসবে! কে তাদের নতুন-নতুন খবর শোনাবে, রঙচঙে ছবিওয়ালা গল্পের বই থেকে গল্প পড়ে শোনাবে! কে তাদের লুকিয়ে-লুকিয়ে চুরণ খাওয়াবে, কি হজমি! কার কথায় তাদের বাবা-মারা এককথায় তাদের খেলার জন্য ছেড়ে দেবে!

সন্ধ্যার অন্ধকার নামছিল। আজ কোনও খেলাই জমেনি। মনে হচ্ছে কোথায় যেন কি একটা হয়ে গেছে। এতদিন বাদে ছোটকুরা ফিরে আসায় যে আনন্দ হয়েছিল তা যেন দপ করে নিভে গেছে। দুটো কথা ঘুরে ঘুরে আসছে। যেতে হবে। কেন? ছোটকুর খুব দুঃখ হতে লাগল। বাবা খুব বেশি দেরি করবে না। যেতে যখন হবেই তখন শুধু দেরি করার কোনও মানে হয়না। কয়েকদিনের মধ্যেই চলে যেতে হবে।

চলে যাব। কেন? ভাবতে গিয়ে ছোটকু দেখতে পেল একটা ফিঙে সামনের মুসুরডাল গাছটার ওপর বসেছে। একদানা ডাল ভিজিয়ে সেটা থেকে ছোটকু এই গাছটা পেয়েছে। প্রথম বছরেই এটা থেকে তিন কিলোগ্রাম মুসুরের ডাল পাওয়া গেছে—যা ছোটকু কেন, অনিলদা, এমনকি বাবা-মা কেউই ভাবেনি।

ফিঙেটা লেজ ঝুলিয়ে ছোটকুর দিকে তাকাল। হাবু, চণ্ডী, পটলা, সোনা সবাই তো এখানেই থাকবে। তবে কেন তারা এখান থেকে চলে যাবে?

পাড়ার বাড়িগুলো থেকে পড়ুয়াদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে। কয়েকটা বাদুড় উড়ে গেল সামনের বটগাছটার দিকে।

ছোটকুর মনে হল, চলে গেলে আর কোনওদিন শ্রাবণীকে হারানো যাবে না। ওই ফার্স্ট থেকে যাবে। অথচ ছোটকু ওকে হারাবে বলে কলকাতায় থাকার সময় রোজ নিজের থেকে চারপাতা করে হাতের লেখা লিখেছে। গতবার অ্যানুয়ালে হাতের লেখার জন্য অংক স্যার ছোটকুর একটা নম্বর কেটে দিয়েছিলেন। আর সে জন্যই শ্রাবণী ফার্স্ট হয়েছিল।

ছোটকুর একটুও যেতে ইচ্ছা করছে না। অনিলদা কলকাতায় যাবে না। জিতেন জ্যেঠুর কাছেই চলে যাবে। ভাবতে গিয়ে ছোটকুর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। সবাই থাকবে। এইসব গাছ, স্কুল, এই শহর, পার্ক, দোকান বাজার, রাস্তাঘাট, নদীপুকুর, শ্রাবণী সেন— কেউই কোথাও যাচ্ছে না। শুধু তারা কলকাতায় যাবে। কেন যাবে?

ভাবতে-ভাবতে ছোটকুর বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল। সে টের পাচ্ছিল তার চোখে জল এসে গিয়েছে। সে একটুও যেতে চায়না। বাবাকে কলকাতা যেতে হবে বলে তাদেরও যেতে হবে। কলকাতায় নাকি ছোটকুর লেখাপড়ার আরও সুবিধা হবে। ছাই হবে।

ছোটকুর কষ্টটা বাড়তে-বাড়তে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আর ঠিক তখনই সামনের জিগা গাছটার রোগা ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে চাঁদটা একলাফে আকাশে অনেকটা উঠে পড়ল।

ছবি : বিজন কর্মকার

আরব্য রজনীর গল্প

চিত্রনাট্য ও ছবি **অমর মজুমদার**

ধারাবাহিক

সওদাগর ও দৈত্যের কাহিনী

হুজুর কী বলব, দশগুণ নয়—বিশগুণ লাভ করেছি।
বাঃ, চমৎকার।
মনে খুব আনন্দ। কাল দেশে ফিরব। বড় ভাই এসে বলল—
ওরে, হিসেব কষে-কষে আর টাকা গুনে-গুনে তো শুকনো কাঠ হয়ে গেলি। চল ফূর্তি করি।
ওদের কথায় বহুৎ খানাপিনা করলাম।
আঃ, প্রাণটা জুড়িয়ে গেল।
রাস্তা দিয়ে একটা সুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে খপ্ করে হাতটা তার চেপে ধরলাম।
কী সুন্দরী, একা কেন? আমি যাব সঙ্গে?
কী বলব হুজুর, মেয়েটা ফিক্ করে হেসে দিল।
ওঃ, কী মিষ্টি সেই হাসি। ওই হাসির দাম লাখ টাকা।
অ্যাঁ!
ও আমায় ঘরে নিয়ে গেল হুজুর। খুব যত্ন করল।
আমি জানতাম, তুমি একদিন আমার কাছে আসবে।
তুমি এত রূপ কোথায় পেলে?
হুজুর, কাল দেশে ফিরব আর আজ পেলাম আকাশের চাঁদ। মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

চলবে

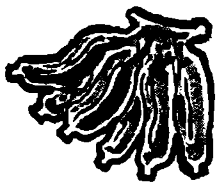

শৈবাল চক্রবর্তী

একটি কদলী কাণ্ড

জীবনবাবুর মুখে ভুবন চৌধুরীর খবর শুনে সামন্তমশাই তো অবাক। ভুবনবাবু গড়পারেই থাকতেন। জীবন মুখার্জির প্রতিবেশী ছিলেন তিনি। বছরখানেক হল এ-পাড়া ছেড়ে বেথুয়াডহরি চলে গেছেন। একটা বাগানবাড়ি কিনে বাস করছেন সেখানে। জীবনবাবু গত রবিবার গিয়েছিলেন সেখানে। ফিরে এসে সামন্তমশাইকে তিনি যা বললেন তা রীতিমত খবর।

ভুবন চৌধুরী যখন জীবনবাবুর প্রতিবেশী ছিলেন তখন যে তাঁদের মধ্যে খুব সদ্ভাব ছিল এমন নয়। দুজনের মধ্যে মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি। জীবনবাবুর বাড়িতে কুকুর-বেড়াল মিলিয়ে পোষ্যের সংখ্যা একডজন, ভুবনবাবু একা মানুষ। চাকর কানাই আর ঠাকুর হরি ছাড়া তাঁর বাড়িতে তৃতীয় কোনও প্রাণী নেই। জীবনবাবু রোগা- পাতলা মানুষ, ইদানিং ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি রেখে চেহারাটা একটু কিম্ভূত করেছেন। ভুবনবাবুর দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথাজোড়া টাক। জীবন মার্টিন কোম্পানিতে চাকরি ছাড়া কোথায় একটা পার্টটাইম করেন। ভুবন চৌধুরী কাজকর্মের ধার দিয়ে যান না। খালি আড্ডা দেওয়া আর শব্দছকের সমাধান ছাড়া আর তিনি কিছু করতেন বলে কারু জানা নেই।

ভুবনবাবুর ধরন-ধারণ ভালো লাগত না জীবনের। কতদিন সামন্তমশাইকে বলেছেন,—একটা লোক খালি শুয়ে-বসে কী করে কাটিয়ে দেয় মশাই, আমি তো ভাবতে পারি না। এতটা আয়েসী হওয়া ভালো কি, আপনি বলুন।

আরও কোনও-কোনও ব্যাপারে ইনি যদি ডাইনে যেতেন, তবে উনি চলতেন বাঁয়ে। ভুবনবাবু ফুটবলের ভক্ত, জীবনবাবু ক্রিকেটের। ভুবনবাবুর মতে ফুটবলের মতো উত্তেজনা আর কোনও খেলায় নেই। জীবনবাবু বলেন,—ফুটবল কোনও খেলাই নয়। বাইশটা লোক একটা চামড়ার গোলাকে নিয়ে জলে-কাদায় ধস্তাধস্তি করছে—এ কোন ভদ্রলোকের ভালো লাগে!

এহেন জীবনবাবু ভুবন চৌধুরীর বেথুয়াডহরির বাগানবাড়ির প্রশংসায় পঞ্চমুখ,—ও মশাই, ভদ্রলোকের যে এত গুণ তা কে জানত। উনি যে এতবড় কলারসিক তা আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি।

তাই নাকি! শুনে সামন্তমশাই নড়েচড়ে বসেন,—আমি জানতুম উনি গুণীমানুষ, চুপচাপ থাকেন। তা কোন কলার চর্চা করতে দেখে এলেন ওঁকে?

কিসের নয়, বলুন। কোনটা ছেড়ে কোনটা বলি। জীবনবাবুর ঢুলুঢুলু চোখ,—আহা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার মানে ছবি আঁকা ধরেছেন ভুবনবাবু। চিত্রকলাও তো কলাই একটা। ভদ্রলোকের যে ছবি আঁকার শখ ছিল তা এখানে থাকতে কেউ জানতে পারেনি। ওখানে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে এখন হাত পাকাচ্ছেন।

যাবেন একদিন দেখে আসবেন,—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান জীবনবাবু, বাজারে যাবেন এখন।—আপনাকেই বিশেষ করে বলেছেন যেতে। দেখে আনন্দ। খেয়েও সুখ।

শেষ কথাটা শুনে একটু খটকা লাগে সামন্তমশায়ের। পরে অবশ্য বুঝতে পারেন কী বলতে চেয়েছেন জীবনবাবু। কেউ গেলে যত্ন করে খাওয়ান তাকে ভুবন চৌধুরী। পুরনো-পাড়ার বন্ধুদের দেখে খুশি হন খুব, তাই প্রাণ-খুলে অতিথি সৎকার করেন। সত্যিকার ভদ্রলোকেরা যেমন করে থাকে।

তারপর একদিন সকালবেলা বেরিয়ে পড়েন সামন্তমশাই। ঘুরে আসবেন ভুবনবাবুর বাগানবাড়ি। আমাদেরও নিতে চেয়েছিলেন সঙ্গে। কিন্তু সামনে পরীক্ষা বলে যাওয়া হয়নি আমাদের তাঁর সঙ্গে।

জগা গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে। জগা তো তাঁর ছায়া। সব কাজের সঙ্গী। বিপদে পড়লে তাঁকে বুদ্ধি জোগায়, আনন্দের মুহূর্তে হাসে একসঙ্গে। সামন্তমশাই আছেন, অথচ জগা নেই—এ-যেন সকাল হয়েছে অথচ সূর্য না-ওঠার মতো ঘটনা।

জগার বয়স উনিশ-কুড়ি। গায়ের রং কয়লাকে লজ্জা দেয়। মাথার কোঁকড়া চুলে সিঁথি-কাটা। পরনে খাটো-ধুতি। হাতকাটা ছিটের শার্ট। মুখে সবসময় হাসি।

সামন্তমশায়ের বয়স ষাট ছুঁই-ছুঁই। একগাল দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা। পরনে ওভারকোট হাতে ছাতা। এই ভাবেই আমরা তাঁকে দেখে আসছি কতদিন তা আমাদের নিজেদেরও মনে নেই।

সকাল দশটা হবে। বেশ ঝরঝরে আবহাওয়া। স্টেশনে নেমে একটা রিকশা ভাড়া করেন ওঁরা। বাড়ির মালিকের নাম বলতে চালক বলে,—কলাভবন তো? ও বাড়ি কে না চেনে! উঠে পড়ুন...।

দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যান তাঁরা। বেশ উঁচু পাঁচিলঘেরা বাগান, মাঝখানে একতলা বাড়ি একটা। রিকশাওলা বলে,—এই যে বাবু এই বাড়ি।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন সামন্তমশাই, পেছনে জগা। বাগানে বিস্তর

গাছপালা, যার মধ্যে কলাগাছই বেশি। একটা বাগানে যে এত কলাগাছ থাকতে পারে, তা সামন্তমশায়ের ধারণায় ছিল না।

বাগানের মধ্যেই দেখা পান তাঁরা ভুবন চৌধুরীর। টেবিল-চেয়ার সাজিয়ে বসেছিলেন তিনি। বাগানের শোভা নিরীক্ষণ করছিলেন নিশ্চয়। সামন্তমশাইকে দেখেই হইহই করে ওঠেন,—আরে, আরে কী সৌভাগ্য! আসুন, আসুন। বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো?

একেবারেই না। রিকশাওয়ালাকে বলতেই সে নিয়ে এল সোজা।

বেশ, বেশ বসুন এই চেয়ারে।—সামন্তমশাইকে বসিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দেন ভুবনবাবু,—ওরে হরি, কানাই কোথায় গেলি। এই দেখ, কে এসেছেন।

কানাই জগারই বয়সি। ছুটতে-ছুটতে এসে সামন্তমশাইকে দেখে একগাল হেসে বলে,—পেন্নাম বাবু, ভালো আছেন তো?

না ভালো নেই,—সামন্তমশাই কিছু বলার আগে বলে ওঠেন ভুবনবাবু, এতটা পথ জার্নি করে এসে কেউ ভালো থাকতে পারে? শীগগির চা নিয়ে এস, চা আর খাবার কিছু। চাঙ্গা করো বাবুকে। —বলেই হাসি হা-হা করে।

এখুনি আনছি বাবু, কানাই বলে,—চায়ের জল চাপানোই আছে।

আমিও যাই ওর সঙ্গে, জগা অনুমতি চায়, দেখে আসি চারদিক—

হ্যাঁ, হ্যাঁ যাও,—ভুবনবাবু উৎসাহ দেন,—আমরা দুজনে বসে গল্প করি নিরিবিলিতে—

ওরা চলে যাওয়ার পর এদিক-ওদিক দেখেন সামন্তমশাই,—অজস্র কলাগাছ দেখছি। বলেন তিনি।

হ্যাঁ, ওই একটাই শখ আমার,—ভুবনবাবু হাসেন। ওই নিয়েই আছি। কলাচর্চার মধ্যে যে এত আনন্দ তা যদি আগে জানতাম—

বলতে-বলতে ট্রেতে করে চা আর প্রাতরাশ এনে হাজির করে কানাই। চা, টোস্ট আর ইয়া বড়-বড় সিঙ্গাপুরি কলা। কলার দিকে তাকিয়ে চোখ বড়-বড় হয়ে ওঠে ভুবন চৌধুরীর।

নিন চা খান,—সামন্তমশাইকে বলেন ভুবনবাবু, একটা কলা তুলে নিয়ে তার খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে কানাইয়ের দিকে তাকান, —তা কানাইচন্দর, জানো তো সামন্তমশাই আমাদের একজন পুরনো বন্ধু। তা ওঁর দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা কী করলে একটু বলো দিকি শুনি—

এইমাত্র ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলে এলুম, বাবু—কানাই বলে,—সে বলল, ভাতের সঙ্গে

কাঁচকলা ভাতে দিয়েছে, শুকতো বানিয়েছে কলা আর কচু দিয়ে, ডাল করেছে সঙ্গে কলার বড়া। বেশ গরগড়ে কোপ্তা হয়েছে কাঁচকলার। আর শেষপাতে চাটনি কাঁঠালি কলা আর কিসমিসের—

বাহবা বাঃ,—ভুবনবাবু হাততালি দিয়ে ওঠেন,—চমৎকার মেনু! শুনেই জিভে জল আসছে আমার। কী মশাই,—সামন্তমশায়ের দিকে ফেরেন তিনি, বলুন হচ্ছে কিনা?

তা হয়তো হচ্ছে,—বিরসবদনে বলেন সামন্তমশাই। চা খেতে-খেতেই যে ভুবন চৌধুরী আধডজন সিঙ্গাপুরী সাবাড় করে দিলেন তা দেখেও চোখ কপালে উঠেছিল তাঁর।

তবে বড্ড বেশি কলা নয় কি? আমতা-আমতা করে বলেন তিনি।

আরে কলার আবার বেশি, কম হয় নাকি। সামন্তমশায়ের হাঁটুতে একটা চাপড় মারেন ভুবনবাবু,—কলার মতো জিনিস আছে? যেমন স্বাদ তেমনি গুণ। ভিটামিনে ভরপুর। মাছ-মাংস কোথায় লাগে! একবার খেলে বুঝবেন।

সামন্তমশাই চুপ করে থাকেন। জগাও মুখে রা কাড়ে না। এত ছলাকলার মধ্যে পড়তে হবে তা বোধহয় স্বপ্নেও ভাবেনি সে।

চলুন,—ভুবন চৌধুরী উঠে দাঁড়ান। বাগানটা ঘুরে আসবেন একচক্কর, খিদেটা চনমনে হবে তাহলে, আসুন।

দুপুরে একগাদা কলার পদ দিয়ে খাওয়া সেরে ভারি বিরক্তবোধ করেন সামন্তমশাই। ভেবেছিলেন এখানে এসে বেহালা শুনবেন, ছবি দেখবেন জলরংয়ের। তা-না, চিবুতে হচ্ছে থোড় আর কলা।

জগারও বেজায় মনমরা ভাব।

চলে আসার আগে ভুবনবাবু আবার এক কাণ্ড করেন। ইয়া বড় মর্তমান কলার এক কাঁদি চাপিয়ে দেন জগার কাঁধে। আপত্তি করলেও শোনেন না।

নিয়ে যান মশাই, হাসতে-হাসতে বলেন তিনি,—এমন ফল বাজারে কিনতে পাবেন না।

যার ফলভোগ করতে হয় জগাকে। বোঝা কাঁধে চাপিয়েই সে বুঝতে পারে কপালে দুঃখু আছে আজ।

দেখার মতো কাঁদি বটে একখানা। সব গাছপাকা মর্তমান আর প্রমাণ-সাইজের। গুনতিতে হবে পঞ্চাশটা। সেটা ঘাড়ে চাপানোর পর জগার তো নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

বিকেলবেলা এদিকে রিকশা মেলে না। খানিকটা হাঁটার পর যা-ও একটা পাওয়া যায় কলার কাঁদি দেখে ডবল ভাড়া হাঁকে সে।

পাঁচ টাকায় হবে না বাবু, সে বলে,—স্টেশনে যাবেন তো? দশ টাকা লাগবে—

তখন আর ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর করার অবস্থা নয়। দুজনে চড়ে বসেন রিকশায়। এখন কোনওরকমে স্টেশনে পৌঁছতে পারলে হয়। তারপর ট্রেন ধরে বাড়ি।

আমার কী ইচ্ছে করছে জানেন বাবু, যেতে-যেতে বলে জগা, এই কাঁদি থেকে এক-একটা কলা ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিই এদিক-সেদিক। আপদ বিদেয় করি এইভাবে।

না, না,—সামন্তমশাই হাঁ-হাঁ করে ওঠেন,—পাড়ার মধ্যে এমনটা করলে ভদ্রলোক টের পেয়ে যেতে পারেন। সে বড় বিশ্রী ব্যাপার হবে। হাজার হলেও বন্ধুলোক।

জগা মাথা নাড়ে,—হ্যাঁ সেও একটা কথা বটে। এভাবে বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো ঠিক হবে না, তাই না বাবু?

জগা যে প্রবাদ ব্যবহার করতে গিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায় তা অনেকের জানা, সামন্তমশাই আর তাই তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেন না।

তার চেয়ে ট্রেনে উঠে দু-একটা স্টেশন পরে এর একটা গতি করলেই হবে,—গলা নামিয়ে বলেন তিনি। গতি কিংবা সঙ্গতি যাই বলিস।

স্টেশনের কাছে আসতে দেখা যায় লেভেল ক্রশিংয়ের গেট বন্ধ। হয়তো কোনও ট্রেন যাবে। এখন কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় কে জানে!

একমিনিটও হয়নি ঘ্যাচাং করে একটা মোটরগাড়ি এসে থামে ওঁদের রিকশার পাশে। দরজা খুলে তীরগতিতে বেরিয়ে আসেন তিনজন ভদ্রলোক। তাঁদের একজনের ছাঁটা-দাড়ি, একজনের বাবরি চুল আর তিন নম্বরের নাকের নিচে ইয়া মোটা পালোয়ানি-গোঁফ।

এই ধরেছি, রিকশার সামনে এসে বলেন ছাঁটা-দাড়ি।

কতক্ষণ ধরে পেছনে যে হর্ন দিচ্ছি,—বাবরি চুলে হাত বোলান দ্বিতীয় জন।

ভাগ্যি গেটটা বন্ধ হয়েছিল,—গোঁফ চুমরে বলেন তিন নম্বর, এখন নামুন তো দেখি রিকশা থেকে। নেমে আসুন জলদি।

আপনারা কারা?—অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছেন সামন্তমশাই। জগার মুখও ভ্রূকুটি-কুটিল।

আমি সুকোমল বল, জবাব দিয়েছেন দাড়িবাবু।

আমি হরিহর ধর, বলেছেন বাবরি-চুল।

আমি কমলেশ কর,—জবাব গুম্ফবানের।

আপনাদের তো চিনি না আমি,—বলেছেন সামন্তমশাই,—কস্মিনকালে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একেবারেই অচেনা।

চিনবেন কী করে, সুকোমল বলেন হাসিমুখে,—এই তো প্রথম দেখা আমাদের। পহেলা মুলাকাত যাকে বলে—

আমরা হলুম বনদপ্তরের কর্মী, পরিচয় বিশদ করেন হরিহর, সরকারি কাজে এসেছি এদিকে। জরুরি কাজ।

আপনাকে আমাদের বিশেষ দরকার, কমলেশ বলেন গোঁফে চাড়া দিয়ে, আপনাকে কিংবা আপনাদের ওই কলার কাঁদিটিকে। ওটি হস্তগত করার জন্যেই পিছু ধাওয়া করা আমাদের। ব্যাস এই মাত্র।

তারপরেই এক কাণ্ড হয়। আচমকা হরিহর পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলেন সামন্তমশাইকে, কমলকৃষ্ণ হাত ধরে টেনে নামান জগাকে আর সুকোমল রিকশাওলার হাতে গোটা দুই নোট গুঁজে দিয়ে তাদের মোটরের ড্রাইভারকে হুকুম দেন। জলদি গিরিধারী, মন্ত্রীমশাই আসার আগে আমাদের ময়দানে পৌঁছতে হবে যে করে হোক।

সে ইঞ্জিন চালু করার আগেই সামন্তমশাই এবং জগাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গাড়ির ভেতর। পেছনের সিটে ওঁদের দুজনের সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে বসেছেন এঁরা দুজনে। জগার কোলে শোভা পাচ্ছে সেই কলার কাঁদি!

গাড়িতে যেতে-যেতে বৃত্তান্ত শোনেন সামন্তমশাই। কাছেই এক কৃষি-বিদ্যালয়ের মাঠে বার্ষিক ফল প্রদর্শনী হচ্ছে আজ। বনমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন তা, পুরস্কার বিতরণও করবেন তিনিই। মুশকিল হয়েছে আম, জাম, লেবু, পেয়ারা ইত্যাদি সব ফল জোগাড় হয়েছে, পাওয়া যায়নি কেবল পাকা-কলা। যে চাষির এই ফলটি আনার কথা ছিল সে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় পৌঁছতেই পারেনি শহরে।

এদিকে মন্ত্রীমশাই আবার কলার বেজায় ভক্ত। তিনি নিজে রোজ টিফিনে দুটি করে কলা খান এবং বন্ধু-বান্ধবদের আরও বেশি করে কলা খেতে উপদেশ দেন। তাঁর বনগাঁর

বাড়ির কলার বাগানটি দেখবার মতো। প্রদর্শনীতে পাকা-কলা আসছে কি না তিনি রোজ তিনবার করে খোঁজ নিয়েছেন। সেই তিনি যদি এসে দেখেন প্রদর্শনীতে সব ফল এসেছে, বাদ কেবল কলা—তাহলে সবাইকে যে তিনি কচুকাটা করবেন তাতে সন্দেহ নেই।

এমনিতে তিনি মাটির মানুষ, সুকোমল বলেন,—কিন্তু রেগে গেলে—

বোমারু-বিমান, তাঁর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন হরিহর ধর।

ক্যামেরার শার্টার টেপার শব্দ শোনা যায়,—ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। দপ-দপ করে জ্বলে ওঠে ফ্ল্যাশ-বাল্ব।

সঙ্গে-সঙ্গে হল ফেটে যায় হাততালির শব্দে। মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা হয় সামন্তমশায়ের, একপাশে তিনি দাঁড়িয়ে আর একপাশে জগা। টেবিলের ওপর সেই কলার কাঁদি, মন্ত্রী যার নাম দিয়েছেন—সোনার খনি।

আহা কী রঙ। কী গড়ন, মন্ত্রীর উচ্ছ্বাস থামতেই চায় না,—আপনাকে আমার কোলে তুলে নাচতে ইচ্ছে করছে।

সামন্তমশাই যত বলতে যান এ কলা তাঁর ফলানো নয় তাঁর এক বন্ধুর বাগানের ফল, মন্ত্রী তত তাঁকে বাধা দিয়ে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন,—সত্যি মশাই, আপনার মতো সবাই যদি কলাচাষে মনোযোগী হতো তাহলে, দেশে অন্নবস্ত্রের অভাব থাকত না।

জগা একবার বলতে চেষ্টা করেছিল,—আমরা কেবল বয়েই মরেছি এ ফল—! তা একবার 'আম' পর্যন্ত। বলেছি কী মন্ত্রী হেসে উঠেছেন, আমও খুব ভালো ফল আমি জানি। আম বলো কী আমড়া, কিন্তু কলার কাছে কিছু নয়। আম কেবল মরশুমেই ফলে, কিন্তু কলা? সে হল বারোমাসের বন্ধু। কি সত্যি কিনা? বলে শ্রোতাদের দিকে তাকাতেই সুকোমল, হরিহর আর কমলেশ একবাক্যে বলে উঠেছে, —সে কথা আর বলতে।

কলাই প্রথম পুরস্কার পায়! নগদ পাঁচ হাজার টাকা আর একটি মানপত্র। সেটি আবার কলার পাতায় লেখা।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মন্ত্রীর গাড়িতেই বাড়ি ফেরেন সামন্তমশাই। তিনি কিছুতে ছাড়তে চান না তাঁকে।—আপনাকে যখন একবার পেয়েছি তখন আর ছাড়ছি না মশাই, বলেন তিনি,— চলুন গাড়িতে যেতে-যেতে কিছু কলাচর্চা করা যাক।

কী ভাগ্যি গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি তাই সামন্তমশাই নিরুপদ্রবে বাড়ি পৌঁছে গেলেন। নইলে কলা নিয়ে আরও কত প্রশ্ন করতেন কে জানে! সামন্তমশায়ের আবার কলা সম্বন্ধে জ্ঞান খুবই সীমিত। ছেলেবেলায় একবার কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন—এই মাত্র!

বাড়ির দরজায় পা দিয়ে বলেন,—ওহ খুব ধকল গেল আজ, কি বল?

জগা হাসে,—হ্যাঁ বাবু, সারা দিনটা কলা-কলা করে কেটে গেল। কলার মধ্যে যে এত কলকজা তা কে জানত!

পকেট থেকে মানপত্রটা বার করে সামন্তমশাই বলেন,—এটা ভুবনবাবুকে পাঠিয়ে দিতে হবে। এটা ওঁরই প্রাপ্য। কলা-সাধনায় উৎসাহ পাবেন ভদ্রলোক। টাকাটা তুই রেখে দে। পরে ওটা আমি ওঁকে দিয়ে দেব। প্রাইজের ওপর সারপ্রাইজ। খুশি হবেন খুব।

নোটের তাড়া জগার হাতে তুলে দেন তিনি,—যৎসামান্য মাইনে দিই তোকে, অথচ খাটুনির অন্ত নেই। এ টাকাটা তোর কাজে লাগুক—

শুনে জগা তো বিগলিত। হাত-কচলে বলে,—অনেক দয়া বাবু আপনার। কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে। অনেক কাজ হবে আমার এ দিয়ে—

তাই? —সামন্তমশাইও হাসেন। কৌতূহলে চকচক করে তাঁর দুটি চোখ। —তা কী করবি তুই এ-টাকা দিয়ে শুনি। বাড়িঘর সারাবি, নাকি পুকুর কাটাবি একটা। তোর অনেকদিনের শখ একটা পুকুরের—

না বাবু,—জগা মাথা নাড়ে,—পুকুর-টুকুর নয়। ওতে বড় হাঙ্গামা। গ্রামদেশে পুকুর আবার চুরিও হয় শুনি। আমি এ-টাকা দিয়ে কী করব জানেন তো। কলাবাগান কিনব একটা। দেখলেন তো কলার কদর। প্রাণপণে চাষ করব—

দড়াম!

ও কী বাবু ও কী! শুকনো-ডাঙায় আছাড় খেলেন দেখি। আঁতকে ওঠে জগা। কী হল বলুন দেখি।

কী আর বলবেন সামন্তমশাই। সকাল থেকে কলা নিয়ে এত ছলাকলা হয়েছে, ভেবেছিলেন কলাপর্ব শেষ হয়েছে। এখন আবার জগার পরিকল্পনা শুনে লুটিয়ে পড়েছেন তিনি কাটা-কলাগাছের মতো।

ষোলকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর।

ছবি : প্রবীরকুমার সামন্ত

ছুটির দিনগুলো ভরে উঠুক আনন্দে

দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দুরন্ত ঈগল
৮০.০০

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
বারোইয়ারি
৪০.০০

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কর্নেলের ৫ রহস্য
৭০.০০

সম্পাদনা
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
জঙ্গল অমনিবাস
৬০.০০

সম্পাদনা
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
কিশোর ভারতী সেরা সমগ্র
১৭০.০০

সম্পাদনা
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
কিশোর ভারতী উপন্যাসসমগ্র
১০০.০০

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

হাওয়াপরির নাচ

একটি পাখি ছোট্ট পাখি নাম জানি না তার
জাগিয়ে দিত সূর্যকে সে সকালবেলাকার
তারপরে সে বসত এসে কৃষ্ণচূড়া ডালে
দেখতে পেত কেউ যেন ঠিক রঙঝর্ণা ঢালে
স্নিগ্ধ ছিল রঙিন ছিল সেদিন পরিবেশ
সেই পাখিটি ভরিয়ে দিত গানের সুরে দেশ
আমিও উঠে খুব সকালে আমার জানালায়
চোখ রাখতাম কেমন করে সেই পাখিটি গায়

হঠাৎ দেখি জমি জরিপ করতে এল কারা
কৃষ্ণচূড়া গাছটি কাটার পর্ব হল সারা
উঠবে নাকি তিনটি সারি বহুতলের বাড়ি
সেই পাখিটি হারিয়ে গেল কোথায় দিল পাড়ি
দুঃসময়ের শিকার হল কৃষ্ণচূড়া গাছ
থামল সেদিন আমার দেখা হাওয়াপরির নাচ
আমার এবং ছোট্ট পাখির রঙিন সে দিনগুলি
তোমরা বলো—ভুলতে পারি? কেমন করে ভুলি?

সুখেন্দু মজুমদার

আকাশ ছোঁয়া মুঠি

এদিক ওদিক খেলছে যারা
খেলুক কাটাকুটি
অন্ধকারে সাজায় কারা
কিস্তিমাতের গুটি।
সাজাক ওরা বাজাক ওরা
আমরা হলাম পাগলা ঝোরা,
মিছিলে পা, ধরছি তুলে
আকাশ ছোঁয়া মুঠি।

ভয়টা কিসের আর,
রহিম, রাকা, ঋভু, তোতন
ওরা সবাই সঙ্গে যখন
মানবো কেন হার।

এইতো ছিল ঝলমলে রোদ
হঠাৎ এল মেঘ
হয়ত বা কেউ দাঁড়িয়ে পড়ে
পালটে গতিবেগ।
দাঁড়াক ওরা হারাক ওরা
টগবগিয়ে ছুটছে ঘোড়া
এক ফালি রোদ দিচ্ছে উঁকি
পালিয়ে যাবে মেঘ।

ছবি : সৈকতশোভন পাল

পার্থপ্রতিম আচার্য

গেণু

আলো টিমটিম ঘোড়ার গাড়ি
ছোটে ঝমঝম ছোটে;
ঘন ছমছম ভূতের বাড়ি
রাতে গমগম ওঠে।

গেণু ঝিমঝিম অঙ্ক করে
গেণু রিমঝিম হাসে,
খাতার পাতায় একখানি হাঁস
ঢেউ শিমশিম ভাসে।

হয় কি পড়া এইভাবে? তাই—
বরফ পাহাড় ডাকে,
পথ টলমল বাঁশের সাঁকো
মাথার ভেতর আঁকে—

জল, পাথরের বাতাস, ডুলি
সমুদ্দুরের নাও;
বই-খাত-পেন বলছে, বাছা
নিরুদ্দেশেই যাও।

সাঁকো ল্যাকপ্যাক পথের দোকান
মাঠে প্যাচপ্যাচ কাদা,
চাকা ক্যাচক্যাচ ঘোড়ার গাড়ি
ধুতি প্যাতপ্যাত দাদা।

চোখ ঢুলুঢুলু পালকি ছোটে
হেই হো জোয়ান হই...
ভয় এসে হাত জড়িয়ে ধরে
সাগর পাহাড় কই।

কোন মুলুকেই কিচ্ছুটি নেই
রাত ঝিমঝিম রাত;
গেণু শিমশিম ঘুমায়, জাগে—
প্রশ্নমালা সাত!

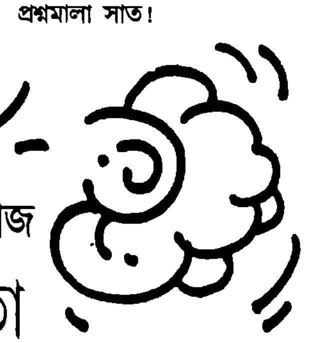

রূপক চট্টরাজ

যাচ্ছে তা

সাতসকালে আওয়াজ শুনি কক্ কক্ ককোর কক্
পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙালে কে হে বাছা আহাম্মক!
পুষলে শেষে মোরগছানা
বুঝছি জ্ঞানের অভাবখানা
ঘিঞ্জি পাড়ায় বাস করে কেউ? যাচ্ছেতা সব খেয়াল শখ।

তরুণকান্তি বারিক

না জড়ালে মাকে

সকাল জাগে ঘুমের চোখে
হাজার ডাকে মার
বাস এসে যায় সাতটা দশে
সময় যে নেই আর।
জলের বোতল, ড্রেস পরানো
আর যা বাকি থাকে
জুতোর ফিতে, টিফিন এবং
সবকিছুতেই মা'কে।

আমার যখন ভাল্ লাগে না
মন বসে না পড়ায়
তখন আবার সব ফিরে পাই
মায়ের গল্প ছড়ায়।
আবার যখন টিভি দেখি
মা এসে কয় পড়ো
ভাল্ লাগে না মায়ের শাসন
একলা লাগে বড়।

তবুও আমার সবখানেতেই
মায়ের ছায়া ফেলা
তাঁর ভাষাতেই কথা শিখি
সঙ্গে সারাবেলা।
অন্য কারোর সঙ্গে কি আর
তুলনা তাঁর থাকে—
রাতের বেলা ঘুম আসে না
না জড়ালে মাকে।

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

প্রবাদী ছড়া

আকাশকুসুম, গোড়ায় গলদ,
কর্তা ভজা, চিনির বলদ,
কেঁচে গণ্ডুষ, তিলকে তাল,
চাঁদের হাটে রাজার হাল।

বাস্তু ঘুঘু, হাতের পাঁচ,
শাক দিয়ে কি ঢাকবে মাছ?
বিনা মেঘে বজ্রপাত,
ঝড়ের আগে এঁটো পাত।

জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ,
কালনেমির লঙ্কা ভাগ।
গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল,
কাকের কি বা পাকলে বেল?

ছবি : সৈকতশোভন পাল

মৃণালকান্তি দাশ

ছু মন্তর ছু

টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার—
ঠ্যাং ভেঙে কুপোকাত অঙ্ক-সার।
ডাংকি ডাংকি ওল্ড অ্যান্ড গ্রে—
অঙ্ক না পারলে মারবেন কে?
থ্যাঙ্ক ফর দি ওয়ার্ল্ড সো সুইট—
চাবকিয়ে সার তোর ফাটাবেন পিঠ।
জ্যাক বি নিম্বল জ্যাক বি কুইক—
সোমবার ইস্কুল আসবেন ঠিক।
ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ হ্যাভ য়্যু এনি উল—
জানো না কিচ্ছু তুমি সবটাই ভুল।
কবলার কবলার মেন্ড মাই শু—
দ্যাখ মজা তুই ছু ছু মন্তর ছু।
হুররে, টম জেরি জ্যাক অ্যান্ড জিল—
ইস্কুল ছুটি, চল টাইগার হিল।

আনসার উল হক

কথোপকথন

ইঁদুর বললে : মামা
কেমন আছ, কিনলে কবে
ঢলঢলে এই জামা?

বিড়াল বললে : কাল
একটা কথা শোন্
রাত্তিরে তুই কোথায় ছিলি?
করেছিলাম ফোন।

ইঁদুর বললে : কেন
কারণটা কী কারণ?
গাল দেখছি ফুলো ফুলো
দিয়েছে কেউ ঝাড়ন?

বিড়াল বললে : ধুৎ
গিয়েছিলাম চায়না
চা খেয়ে যা খবর আছে
একটু কাছে আয়না।

ইঁদুর বললে : না
একটু আগে খেলাম
পেটটা তোমার ধুঁকছে খিদেয়
বিপদ-গন্ধ পেলাম
এখন আমি আসছি মামা
সেলাম তোমায় সেলাম॥

জ্যোতির্ময় মল্লিক

সুখী মানুষের জামা

অনেক-অনেক দিন আগের কথা। উত্তর আফ্রিকায় ছিল এক রাজা। তার ছিল অগাদ ধন-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত, হাতি-ঘোড়া, কোনও কিছুর কমতি ছিলনা। স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে সবই ছিল। কিন্তু সব থাকলে কি হবে। তার মনে কোনও সুখ ছিল না।

সবসময় রাজা চিন্তা করত আমার সবই আছে, ধন-সম্পত্তি, ছেলে-মেয়ে, লোক-লস্কর। কিন্তু এসব কিছু আমাকে সুখী করতে পারছে না! কি করলে আমি সুখী হব। কে আমাকে সুখী হবার উপায় বাতলে দেবে আমি জানিনা-জানিনা।

একদিন সভাসদবর্গের সামনে সিংহাসনে বসে রাজা চিৎকার করে বললেন,—আমি কেন সুখী হতে পারছিনা! কি করলে আমি সুখী হতে পারব তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি বলতে পারনা? এই বলে রাজা বিলাপ করতে থাকল।

রাজার বিলাপ শুনে একজন সভাসদ বলল,—মহারাজ, সুখী হওয়ার জন্য আপনাকে আমি একটি উপায় বাতলাতে পারি। তারপর সেই সভাসদ বলল,—আপনি রাতে মুক্ত আকাশের দিকে নিষ্পলক তাকান। দেখবেন কি সুন্দর ঝকঝকে চাঁদ-তারা-নক্ষত্র। এসব দেখতে-দেখতে আপনার মন ভরে যাবে। এভাবেই আপনি সুখী হতে পারবেন।

না-না-না-না। —রাজা রেগে গিয়ে উত্তর করলেন। যখনই আমি আকাশের তারা-চাঁদের দিকে তাকাই তখনই আমার রাগ হয়ে যায়। কারণ আমি জানি যে আকাশের চাঁদ-তারা কোনওটাই আমি পাব না। অন্য পথ বাতলাও।

তখন অন্য একজন সভাসদ বললেন, —মান্যবর, সংগীত শুনে দেখতে পারেন। সংগীত মানুষকে শান্তি দিতে পারে। সুখী করতে পারে। আমরা ভোরবেলা থেকে রাত অবধি আপনার সামনে সুশ্রাব্য সংগীত পরিবেশন করব। আমার বিশ্বাস সংগীত শ্রবণ করলে আপনি সুখী হতে পারবেন।

এই কথা শুনে রাজা রেগে আগুন হয়ে বললেন,—কি বোকার মতো যুক্তি তোমাদের। সংগীত নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু তাই বলে ভোরবেলা থেকে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত সংগীত শুনতে হবে! তাও আবার দিনের-পর-দিন! অসম্ভব! অসম্ভব! এই চিন্তা তোমাদের মাথায় এল কীভাবে?

সংগীত শোনার প্রস্তাব দিয়ে ছিল যে সভাসদ সে তাড়াতাড়ি রাজার সামনে থেকে সরে পড়ল। রাজা রাগে গজগজ করতে-করতে তার খাস কামরায় বিশ্রাম নেবার জন্য প্রবেশ করলেন।

একটু পরে মুখ্যমন্ত্রী, রাজার খাস কামরায় ঢুকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন,—মহারাজ, আমার একটি কথা আছে। যদি অভয় দেন তো বলতে পারি।

রাজা বলেন,—আপনি নির্ভয়ে বলুন সে-কথা।

মুখ্যমন্ত্রী একটু কেশে বললেন,—আমি একটি উপায় আপনাকে বলতে পারি যা আপনাকে অত্যন্ত সুখী করতে পারে।

রাজা সাগ্রহে বললেন,—বলুন-বলুন মুখ্যমন্ত্রী, কি উপায় সেটি?

মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিলেন,—এটি অত্যন্ত সহজ উপায় মহারাজ! প্রথমে আপনাকে একজন সুখী মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে। তারপর সেই সুখী মানুষটির কাছ থেকে জামাটা নিয়ে আপনাকে পরতে হবে। এতে ওই সুখী মানুষটির সমস্ত সুখ শান্তি আপনার দেহে প্রবেশ করবে। আপনি তখন সেই সুখী মানুষটির মতোই সুখী হবেন।

রাজা সব শুনে বলেন,—তোমার যুক্তিটি আমার পছন্দ হয়েছে। আমি যেভাবে পারি প্রথমে একজন সুখী মানুষ খুঁজে বের করব।

তারপর একজন সুখী মানুষের খোঁজে রাজা তার সৈন্য-সামন্তদের দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন।

সৈন্য সামন্তরা যাকে পায় তাকেই জিগ্যেস করে সে সুখী কিনা? সবার উত্তর একই, না তারা সুখী নয়। এমনি ভাবে দিন যায়, রাত যায়, মাস যায়, বছরও পার হতে চলল, খুঁজে-খুঁজে সবাই হয়রান। কিন্তু কোথাও আর একজন সুখী মানুষের সন্ধান পাওয়া গেলনা।

সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে ফেলেছিল প্রায়। অবশেষে দেশের প্রান্তসীমায় অবস্থিত বন ভূমির মধ্যে পাওয়া গেল এক কুঁড়ে ঘর। সৈন্যরা সেখানে দেখতে পেল শক্তসমর্থ ছোটখাটো একজনকে। সে আপন মনে কাজ করে চলেছে। মুখখানি তার অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত।

সৈন্যরা তাকে জিগ্যেস করল,—তুমি কি সুখী?

সাথে-সাথে সেই লোকটি জবাব দিল, —অবশ্যই। পৃথিবীর মধ্যে আমিই সবথেকে সুখী মানুষ।

ব্যস, সৈন্যদের আর পায় কে। তারা সেই মানুষটিকে মহাসমাদরে নিয়ে এল রাজবাড়িতে। এরপর রাজাকে খবর পাঠানো হল, মহারাজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষটিকে তারা খুঁজে এনেছে।

খবর পেয়ে রাজা মহাখুশি। খুশিতে সবকিছু ভুলে এক পাক নেচে আপন মনে বলে উঠল,—শেষমেশ তাহলে আমি সুখী মানুষ হতে যাচ্ছি। এক মুহূর্তে দেরি নয়, এখুনিই আমি তার জামা পরে ফেলব।

রাজা তার বিশ্রামাগার থেকে হুকুম

দিলেন,—মহাভাগ্যবান সেই সুখী মানুষকে এখানেই নিয়ে এসো। এখানে আমি তার সঙ্গে কথা বলব।

প্রহরীরা বিশ্রামাগারের দরজা খুলে দিল। মন্ত্রী সভাসদ পরিবেষ্টিত অবস্থায় রাজা বসে আছেন। তখন অনাবিল হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে ছোট খাটো সেই কাংক্ষিত মানুষটি খাস কক্ষে প্রবেশ করল।

রাজা সাগ্রহে সেই মানুষটিকে বরণ করে বললেন,—আমার পাশে এসো বন্ধু! পথে তোমার কোনও কষ্ট হয়নি তো!

পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষটি হাসতে-হাসতে রাজার কাছে এগিয়ে গেল। রাজা এবার ভালো করে তার দিকে তাকালেন।

কিন্তু তিনি কি দেখছেন? এই সেই সুখী মানুষ! যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সুখী! লজ্জা নিবাররণের জন্য কোমরের কাছে একচিলতে কাপড় ছাড়া যার সারা গা উদোম!

রাজা ভাবলেন জামাটি হয়তো কোথাও লুকানো আছে। তাই তিনি বললেন,—যত ধন-রত্ন চাও তোমাকে দিচ্ছি। তার বিনিময়ে তোমার জামাটি আমাকে দাও। দেরি করো না বাপু!

তখন সেই সুখী মানুষটি বলল,—রাজামশাই আমার তো কোনও জামা নেই!

আফ্রিকার রূপকথা—The Happy Man-এর বাংলা রূপান্তর।

ছবি : সৈকতশোভন পাল

Acc. No.

ছোটকু
আর
সুপার কম্পিউটার
সুদীপ্ত মণ্ডল
পড়াশুনোয় কিছুতেই মন বসছে না। দেখি সুপার কম্পিউটার কী বলে।
আপনি বরং ঘুরে আসুন।
আঃ, কী মনোরম পরিবেশ!
অনেকদূর চলে এসেছি। আরে! উনি ওখানে কী করছেন?
আমি লৌহদণ্ডটাকে সূঁচ করতে চাই।
এই মোটা লৌহদণ্ড সূঁচ হবে কী করে?
কেন নয়? ঘষতে-ঘষতে এটি পাতলা হবে আর একদিন সূঁচ হয়ে যাবে।
ঠিক! বারবার পড়লে মুখস্থ হবেই। এখনই বাড়ি ফিরে পড়তে বসব।
পরে
বাঃ! আপনার পড়া মুখস্থ হয়েছে।
কিন্তু ভোৎকু খারাপ উদ্দেশ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

তাই বুঝি! বাবাকে নিয়ে এখনি হুলোটার নুলো ভাঙতে যাচ্ছি।
তখন পাড়ার মন্দিরে ভোংকু
নতুন ঘণ্টাটা দেখে বড্ড লোভ হচ্ছে। কিন্তু ওটা ছুঁলেই বাজতে শুরু করবে।
যদি আওয়াজ ছাড়া ঘণ্টাটা ঝেড়ে দেওয়া যেত তবে চমৎকার হতো। 'ভালো খাবো' রেস্তোরায় বিরিয়ানি—
উলস্!
আরে! আমি কি মুখ্যু! ব্যাপারটা তো খুবই সোজা। ঘণ্টার আওয়াজ যদি কানেই না ঢোকে তাহলে কে ধরছে আমাকে!
নিজের যুক্তিতে নিশ্চিন্ত হয়ে দুকানে তুলো গুঁজল।
হ্যাঃ! কোনও শব্দই শোনা যাচ্ছে না।
ঘণ্টাটা ছোঁয়ামাত্র তুমুল আওয়াজ!
ঢং ঢং ঢং
ওই দ্যাখো বাবা, ভোংকাদা!
মরেচে! এই দুজন কোত্থেকে এসে জুটল!
দাঁড়া নচ্ছার। এক ডাণ্ডায় ঠাণ্ডা করে দেব।
উঃ উঃ উঃ! পালাতে পারলে বাঁচি।

ধ্রু ব জ্যো তি চৌ ধু রী

ঝড়ের রাতে নদীর ধারে

শার্দুল সিংহ ছিল সত্যিই এক সার্থকনামা পুরুষ। বাঘের সাহস আর সিংহের উদারতা—এ দুটি গুণই তার মধ্যে সমানভাবে ফুটে উঠেছিল। ও ছিল যেমন সৎ, তেমনই পরোপকারী। সেনাবাহিনীতে ওর বীরত্বের কথা ও-তল্লাটের লোকের মুখে-মুখে ফিরত। তাই সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে ও যখন নিজের গ্রামে ফিরে এল, তখন গ্রামের লোকেরা আনন্দে-আত্মহারা হয়ে প্রায় জোর করেই ওকে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদটিতে বসিয়ে দিল, এবং প্রায় এর সঙ্গে-সঙ্গেই আর-একটি চরম-দায়িত্বের কাজ তাকে নিতে হল। ও-গ্রামের ঠিক মুখটিতেই একটি পাহাড়ি-নদী নেমে এসে হঠাৎ ঘুরে গিয়ে গ্রামের বেশ একটু দূর দিয়ে বয়ে চলেছিল। তার ফলে শার্দুল সিংহের গ্রাম ছাড়া ওই অঞ্চলের আরও অনেকগুলো গ্রাম জলের অভাবে শুকিয়ে মরত। তাই সেচ দপ্তর থেকে গ্রামের ঠিক ওপরে নদীর বাঁকটি থেকেই একটি খাল কেটে ওই অঞ্চলের গ্রামগুলির অন্য পাশে ক্ষেতের দিক দিয়ে নিয়ে গিয়ে অনেকটা দূরে আবার ওই নদীটির সঙ্গেই মিলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নদী আর খালের ঠিক মুখটিতে বসানো হয়েছিল একটি জল আটকানোর 'স্লুইস গেট'—যেটি খুলে বা বন্ধ করে সময়মতো নদী থেকে খালে জল ঢোকানো বা আটকানো যাবে। শার্দুল সিংহ গ্রামে ফিরে আসার পরে এই গেটটি দেখাশোনা করা, খোলা এবং বন্ধ করার পুরো দায়িত্বটি এসে গেল শার্দুল সিংহেরই ওপর—আর কারও কথা ওই তল্লাটের কোনও লোক ভাবতেই চাইল না। গেটটি তৈরি করার কাজও শেষ হল শার্দুল গ্রামে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই—তাই প্রথম দিন থেকে ওই গেটটি দেখাশোনা করা যেন শার্দুলেরই নিজস্ব এক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়াল।

শার্দুল সিংহের বড়-ছেলে কুন্দন সিংহ ছিল যাকে বলে একেবারে 'বাপকা বেটা'। চেহারায় আর স্বভাবে সে ছিল বাবার এক নিখুঁত-প্রতিচ্ছবি। শার্দুল অবসর নেওয়ার আগেই কুন্দন সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, এবং এর মধ্যেই ওর সাহসের খ্যাতিও লোকের মুখে-মুখে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল। কুন্দন ছিল যেমন ডানপিটে আর বেপরোয়া, তেমনই হাসিখুশি আর মিশুকে। সাঁতার কাটা, নৌকা চালানো, মাছ ধরা—সবকিছুতেই ওই তল্লাটে তার কোনও জুড়ি ছিল না। নদীটাকে ও যেন নিজের হাতের তালুর মতোই চিনত। নদীর পাড়টি ছিল ওর সব চাইতে প্রিয় জায়গা—প্রায়ই সেখানে গিয়ে ঘাসের বিছানায় শুয়ে থাকত সে। যতদিন ও বাড়িতে থাকত, ততদিন ওর ছোট ভাই চন্দন আর পোষা-কুকুর ঝুমরু একমুহূর্তের জন্যও ওকে ছেড়ে নড়ত না।

ইদানিং স্লুইস গেটটা খুলতে বা বন্ধ করতে শার্দুলের একটু অসুবিধা হচ্ছিল। বিশেষত যে হাতল বা স্প্যানারটা তুলে কবজার গায়ে লাগিয়ে গেটটা খুলবার বা বন্ধ করবার জন্য ঘোরাতে হতো, সেটা ছিল যেমন বড়, তেমনই ভারী। কুন্দন বাড়িতে থাকলে অবশ্য শার্দুলের কোনও চিন্তা থাকত না—সব কিছু কুন্দন একলাই সামলাত, বাবাকে গেটটায় হাত লাগাতেই দিত না। কিন্তু কুন্দন যখন থাকত না, মুশকিলটা হতো তখনই। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শার্দুলের শরীরের জোরও কমতে শুরু করেছিল, তাই গেট সামলানোর মতো ভারী কাজ একলা সামাল দেওয়া শার্দুলের পক্ষে ক্রমশই বেশ কঠিন হয়ে উঠছিল। ওর এই অসুবিধার কথা অবশ্য ও ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানায়নি, এমন কী, নিজের স্ত্রীকেও নয়।

সে-বছর খুব খরা চলছিল—নদীতে জল প্রায় ছিল না বললেই চলে। শার্দুলের ওপর কাজের চাপটাও তাই কম ছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রকৃতিদেবী যেন পাগল হয়ে গেলেন—বিকেলবেলা আচমকা ধেয়ে এল দুরন্ত ঝড়, তার সঙ্গে শুরু হল অঝোরে বৃষ্টি। চারিদিকে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে বাড়ির চাল উড়ে গিয়ে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হল। বেশ কয়েকঘণ্টা ঝড়ে প্রকৃতির এই তাণ্ডব চলতেই

থাকল। পাহাড় থেকে প্রচণ্ড বেগে নেমে আসা জলের তোড়ে নদী ফুঁসে উঠল,—তার ক্রমশ ফুলে-ওঠা জলরাশি দুর্বার-গতিতে বয়ে যেতে লাগল। শেষপর্যন্ত এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, তখনই স্লুইস গেট না-খুলে দিলে নদীর দুকূল ছাপিয়ে বান ডাকবে, এদিকে খাল যাবে শুকিয়ে। আর যদি জলের প্রচণ্ড-তোড়ে স্লুইস গেটে ফাটল ধরে বা সেটা ভেঙে যায়, তাহলে তো একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। শার্দুলের গ্রামসমেত এক বিশাল অঞ্চল চলে যাবে জলের তলায়—নদী আর খাল একাকার হয়ে যাবে।

শার্দুলের শরীর আর মন—কোনওটাই সেদিন ভালো ছিল না। কুন্দন যেখানে এখন আছে, সেই কাশ্মীর-সীমান্তে প্রায় পুরোদস্তুর যুদ্ধ লেগে গিয়েছে। প্রত্যেক দিনই অনেক জওয়ান হতাহত হওয়ার খবর আসছে। তাই নিজের ঘরে চুপ করে বসে ছিল শার্দুল। কিন্তু

কয়েকঘণ্টা ধরে সমানে ঝড়বৃষ্টি হওয়ার পরেও যখন তা কমার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না, তখন শার্দুল আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না। ত্রিপলের মোটা বর্ষাতিটা গায়ে চাপিয়ে হাতে একটা লণ্ঠন নিয়ে ওই দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল সে। ঝুমরুও চলল তার মনিবের সঙ্গে। বাড়ির পেছন দিকের দরজা দিয়েই নদীর ধারে যাওয়ার সোজা রাস্তা। শার্দুলের স্ত্রী কাঁদতে-কাঁদতে দরজা পর্যন্ত স্বামীর পেছন-পেছন গেলেন। তাঁর কোনও অনুনয় বা নিষেধেই অবশ্য শার্দুল কান দিল না।

ছোট-ছেলে চন্দন এককোণে বসে সবকিছু লক্ষ্য করছিল। বাবার সঙ্গে গেট খুলতে যাওয়ার খুবই ইচ্ছে থাকলেও বাবার এ-ব্যাপারে একেবারে কড়া নিষেধ ছিল। কিন্তু অসুস্থ-শরীরে বাবাকে ওই দুর্যোগের মধ্যে বেরোতে দেখে চন্দন ঠিক করে ফেলল আজ সে বাবার সঙ্গে থাকবেই। সে-ও তো শার্দুল সিংহের ছেলে, কুন্দন সিংহের ভাই। বাড়ির সামনের দরজা দিয়ে টুক করে বেরিয়ে পড়ে একটা ঘুরপথ দিয়ে গিয়ে সে ঠিক হাজির হল বাবার পেছনটিতে। শার্দুল ওকে দেখে দারুণ রেগে গেল বটে, কিন্তু বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দিল না—মনে-মনে বোধহয় শার্দুলও চাইছিল, ওর সঙ্গে এই রাতে কেউ একজন থাকুক।

গেটটার একেবারে পাশেই একটা বড় গাছ ছিল। তার নিচে নদীতে ভেসে আসা কাঠের টুকরো, ডালপালা জমা করে রাখা হতো। শার্দুল চন্দন আর ঝুমরুকে তার আড়ালে বসিয়ে দিল। এবার চন্দনের হাতে লণ্ঠনটা ধরিয়ে দিয়ে তার আলোটা ঠিকমতো গেটের ওপর ফেলতে বলে গেটটা খোলার কাজ শুরু করল শার্দুল।

বৃষ্টি আর ঝড় একইভাবে হয়ে যাচ্ছিল। লণ্ঠনের টিমটিমে আলোয় ওই অন্ধকার দুর্যোগের রাতে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অসম-সাহসী শার্দুল অবশ্য তাতে দমে গেল না। বিশাল হাতল বা স্প্যানারটা কব্জার মুখে লাগিয়ে প্রাণপণে সে দুহাত দিয়ে হাতলটাকে ঠেলে তুলে ঘোরাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টির তোড়ে ওর হাতদুটি পিছলিয়ে যাচ্ছিল—কিছুতেই ভেজা হাতলটাকে তুলতে পারছিল না সে। একবার তো পা পিছলিয়ে গিয়ে শার্দুল প্রায় নদীর মধ্যে পড়েই যাচ্ছিল। চন্দনের মনে হচ্ছিল, সে-ও ছুটে গিয়ে বাবাকে সাহায্য করে। কিন্তু বাবা তাহলে ভয়ানক রেগে যাবে। তবে চন্দন খুব ভালো ভাবেই বুঝতে পারছিল যে এই বৃষ্টি আর ঝড়ের কাছে আজ ওর বাবাকে হার মানতে হবে—একলা ভিজে-হাতে ওই ভিজে-পিছল হয়ে যাওয়া ভারী, প্রকাণ্ড হাতলটাকে কিছুতেই তুলে ঘোরাতে পারবে না তার বাবা। ঝুমরুর গলার শেকলটা চেপে ধরে রেখে লণ্ঠনের আলোটাকে যতটা পারা যায় গেটের কব্জাটার ওপর ফেলতে চেষ্টা করল চন্দন, আর মনে-মনে ভাবতে লাগল—আহা, এখন যদি দাদা থাকত!

হঠাৎ চন্দনের মনে হল, ওর চোখে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে—সব কিছু যেন দুটো করে দেখছে সে। ওর বাবার ঠিক পাশে বাবারই মতো একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে—চন্দনের হঠাৎ মনে হল, ছায়ামূর্তিটা যেন বাবার শরীরের ভেতর থেকেই আলাদা হয়ে বেরিয়ে এল। সেই ছায়ামূর্তিটা ওর বাবাকে ধরে ঠিকভাবে দাঁড় করাল, আর তারপর বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাতলটা ঠেলে তুলে কব্জার সঙ্গে আবার ঠিকমতো লাগিয়ে সেটাকে ঘোরাতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দুজনে মিলে স্লুইস গেটটা খুলে ফেলল, আর ফুঁসে ওঠা নদীর জল হু-হু করে খাল দিয়ে বেরিয়ে যেতে লাগল।

কাজ শেষ করে শার্দুল চন্দনের কাছে ফিরে এল—চরম ক্লান্তি আর অবসাদে প্রাণপণে হাঁফাচ্ছিল সে। ওই ছায়ামূর্তিটার উপস্থিতি যে বাবা ভালোভাবেই টের পেয়েছে, সেটা চন্দনের বুঝতে কষ্ট হয়নি। চন্দন গেটটার দিকে তাকিয়ে দেখল, ছায়ামূর্তিটাকে তখনও দেখা যাচ্ছে—গেটের সামনে নদীর ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। একটু পরেই অবশ্য ছায়ামূর্তিটা আস্তে-আস্তে চলতে শুরু করে নদীর উঁচু-পাড় বেয়ে উঠে চোখের আড়ালে চলে গেল। ঝুমরুও হঠাৎ এক ঝটকায় চন্দনের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নদীর পাড় বেয়ে উঠে সোজা দৌড় লাগাল ছায়ামূর্তিটার দিকে। ঝড় আর বৃষ্টির বেগও ঠিক এই সময়েই একটু কমে এল। শার্দুল কেমন যেন একটা চাপা, ভাঙা-গলায় বলে উঠল,—ঠিক আছে, ওদের যেতে দে। চলরে চন্দন, বাড়ি যাই।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে চন্দন দেখল—কী এক তীব্র যন্ত্রণায় বাবার মুখটা যেন একেবারে কুঁচকিয়ে গিয়েছে—দুগাল ছাপিয়ে বৃষ্টির জলের সঙ্গে অঝোরে নেমে আসছে চোখের জল।

কাঁপতে-কাঁপতে কোনওরকমে বাড়ি ফিরে এল শার্দুল আর চন্দন। চন্দনের মা তখনও একইভাবে পেছনের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। শার্দুলের সঙ্গে চন্দনকে দেখে তিনি তো একেবারে আঁতকিয়ে উঠলেন—চন্দন যে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছে, সেটা তিনি টেরই পাননি। কিন্তু তারপরে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থরথর করে কেঁপে উঠলেন,—তাঁর চোখমুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। এতক্ষণ পরে কঠিন-হৃদয় শার্দুলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল—একবারে ছেলেমানুষের মতো চিৎকার করে কেঁদে উঠল সে। মাথা নেড়ে খালি বলতে থাকল—সব শেষ! সব শেষ। চন্দনের মা স্বামীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে তাকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, তারপর নিজেও মাটিতে বসে পড়ে ডুকরিয়ে কেঁদে উঠলেন। চন্দনকে বাড়ির বুড়ি দাইমা বকতে-বকতে জামাকাপড় ছাড়িয়ে গা মুছে দিয়ে শুইয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে ভিজে সপসপে হয়ে ঝুমরুও বাড়ি ফিরে এল—তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। মাঝে-মাঝে চাপা গলায় কেঁদে উঠছে। চন্দন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল—ওই ছায়ামূর্তিটা তো দাদাই ছিল নিশ্চয়ই—এখন সে সেটা বুঝতে পারছে। কিন্তু দাদা এল কোন দিক দিয়ে, কীভাবে? দাদা বাড়ি ফিরেই- বা আসছে না কেন? বাবা আর মা-ই-বা এত কান্নাকাটি করছে কেন? একথা ভাবতে-ভাবতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

পরের দিন এক সামরিক-বার্তার মাধ্যমে এসে পৌঁছল সেই অবধারিত, চরম দুঃসংবাদ—কুন্দন সিংহ কারগিল রণাঙ্গনে শত্রুর সঙ্গে হাতাহাতি-লড়াইয়ে মারা গিয়েছে। তবে নিজে মরার আগে তিনটে শত্রুকে খতম করেছে সে।

বিদেশি গল্পের ছায়া অবলম্বনে

ছবি ঃ ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

অভিজিৎ সেনগুপ্ত

তেলুগু বেড়াল

বড়দিনের ছুটিতে মা-বাবার সঙ্গে গোপালপুর বেড়াতে এসেছে ঝুমকি। কিন্তু মনটা তার মোটেই ভালো নেই। সমুদ্রের একেবারে গায়ে দিব্যি ভালো হোটেলে এসে উঠেছে তারা। সামনে টানা লম্বা ঝকঝকে মার্বেল-বসানো বারান্দা। বারান্দায় সুদৃশ্য রঙিন সব চেয়ার পাতা। সারাদিন বারান্দায় বসে শীতের মিষ্টি রোদ পোহাও আর সমুদ্র দেখো—কে আপত্তি করছে? আপত্তি করার কারণও নেই কোনও। জীববিজ্ঞান-ভৌতবিজ্ঞানের যতসব ভুতুড়ে উৎপাত নেই—বীজগণিত-জ্যামিতির ঝঞ্ঝাট নেই—শুধু সামনে নীল আকাশ, নীল সমুদ্র তাতে সাদা ফুলের মালার মতো ঢেউ আর লাল-নীল পালতোলা অজস্র নৌকো। অনেকটা দূরে একটা জাহাজঘাটা সমুদ্রের ভিতর ঢুকে গেছে। সেখানে কালো তিমিমাছের মতো একটা জাহাজ সারাদিন ধরে দাঁড়িয়ে আছে তো দাঁড়িয়েই আছে। সব মিলিয়ে যেন ভারি চমৎকার একটি ছবি। তারিয়ে-তারিয়ে খালি দ্যাখো। কিন্তু দেখার মতো অবস্থা নেই ঝুমকির, কেননা তার মন ভালো নেই। আর এই মন ভালো না থাকার কারণ আর কেউ নয়, স্বয়ং তার বাবা শ্রী যুধিষ্ঠির রায়। তার মতো নিরীহ নরম মেয়ের এরকম হৃদয়হীন বাবা হল কী করে কে জানে।

মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে ভাবে ঝুমকি। ঠাকুর্দাও সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্র—পুত্রস্নেহে অন্ধ না-হলে যার নাম রাখা উচিত ছিল দুর্যোধন, তার নাম যুধিষ্ঠির রাখে কেউ?

গোপালপুর যাবে বলে বেরহামপুরের জন্য যখন তিনখানা টিকিট কাটতে যাচ্ছে যুধিষ্ঠির, তখনই টনক নড়েছিল ঝুমকির।

—তিনখানা নয় বাবা, মাই ডিয়ার ফাদার, তিনখানা নয়, ভেবে দ্যাখো, চারখানা টিকিট হবে।

—চারখানা কী রকম? চোখ চড়ক গাছ যুধিষ্ঠিরের,—মানুষ তো আমরা তিনজন।

—কুট্টুসকে তুমি মানুষ না-মনে করতে পার বাবা, সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু মানুষের চেয়ে ও কোনও অংশেই খাটো নয়। ওর টিকিট তোমাকে একটা কাটতেই হবে। উইদাউট টিকিটে গিয়ে ও একটা ঝামেলায় পড়ুক সেটা আমার ইচ্ছে নয় বাবা, তাছাড়া সবারই একটা মান-সম্মান আছে।

বইপত্র গোছাতে-গোছাতে গম্ভীর-গলায় বলেছিল ঝুমকি।

—ওহ কুট্টুস! কুট্টুস! কতবার বলেছি ঝুম বেড়ালের এরকম ঝকঝকে নাম হয় না। যে-রকম জিনিস তার সে-রকম নাম। তুমি ওর নাম মন্থরা রাখলেই পারতে—সেরকমই কুঁজো আর ধূর্ত ওটা।

—ওহ বাবা—ওটা হুলো। কী ডাক্তারি পাশ করলে তুমি? স্ত্রী-পুরুষ জ্ঞান নেই? নাকি ব্যাকরণের স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ গুলে খেয়েছ? কোনটায় ফাঁকি দিয়েছিলে বুঝতে পারছি না। আর ওর নাম কুট্টুস হতে পারে কিনা ডেকেই দ্যাখো ওকে। অন্য কোনও নামে ডাকলে আসবেই না ও। এককিলো চিতলের পেটি সামনে ধরলেও না। যাক যা বলছিলাম—তিনখানা নয়, চারখানা টিকিট।

—সরি ঝুম, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। টিকিটে তো একটা নাম দিতে হয়। কী নাম দেব ওর!

—কেন! কুট্টুস সেনগুপ্ত।

—সেনগুপ্ত!

—না তো কি? সেনগুপ্তের বাড়ির বেড়াল চৌধুরি কিংবা চক্রবর্তি নাকি?

—ইমপসিবল ঝুম। সবারই একটা বংশমর্যাদা আছে। আমার বাড়ির বেড়ালের টাইটেল আমি সেনগুপ্ত দিতে পারব না।

—হ্যাঁ, মানমর্যাদা সবারই আছে বাবা। বেড়াল বলেই তো আর হেলাফেলা করার নয়—

—থামো। ওই তো কালোকুষ্ঠি একটা বেড়াল। কোথাও একটা সাদা ছোপ অবধি নেই—এইসব বেড়াল নিয়েই এডগার অ্যালান পো ভূতের গল্প লিখতেন, জানো?

—মনে রেখো বাবা মানুষ মরলেই ভূত হয়—বেড়াল মরলে নয়। এ-ব্যাপারে বেড়ালরা অনেক ভদ্র।

—উঃ তর্ক করো না ঝুম—তোমার বেড়ালের টিকিট হচ্ছে না।

—ছিঃ এইটুকু ছোট্ট ফুটফুটে একটা মেয়ের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়া করতে তোমার একটুও খারাপ লাগছে না বাবা? জানো বইতে লিখেছে আমাদের বয়সি মেয়েদের মন কত নরম আর টাচি হয়। যাক আশা করি, কালই কুট্টুসের টিকিটটা হয়ে যাচ্ছে। যাই—স্কুলে আবার কাল এ বি সি ডি লিখতে দিয়েছে।

যুধিষ্ঠির রান্নাঘরের উদ্দেশে চেঁচায়,—শোনো, শুনছ, তোমার মেয়ের হুকুমটা শুনে যাও—

আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে আসে রমা—কী হল? বাড়িতে ডাকাত পড়েছে নাকি!

—হ্যাঁ ডাকাতই পড়েছে। ফুলন দেবী।

—ছিঃ নিজের মেয়েকে ডাকাত বলতে নেই। যুধিষ্ঠির বলে,—শোনো, তোমার ওই এক কেজি আলকাতরার জন্য নাকি রেলের টিকিট কাটতে হবে।

রমা বলে,—কী বুদ্ধি তোমার, ওইটুকু মেয়েকে বোঝাতে পারছ না যে রেলে পশুপাখির টিকিট দেয় না। ওদের মালগাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।

যুধিষ্ঠির কান-চুলকে বলে—তাই তো...একথাটাই তো আমার মাথায় আসেনি যে বেড়ালরা মানুষ নয়, এটা একটা মোক্ষম পয়েন্ট বের করেছ রমা...

ঝুমকি কোমরে হাত দিয়ে গট-গট করে এগিয়ে আসে,—তাহলে তোমরা বলতে চাইছ কুট্টুস একটা মাল—কথাটা কিন্তু আমার মনে থাকবে বাবা।

—না, না মা—মাল হবে কেন? এমন কামাল একটা প্রাণী,—রমা ওকে যথাসাধ্য সম্ভব আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে—কিন্তু বলছিলাম কী টিকিট কেটে নিয়ে যাব, তারপর টিকিট-চেকিংয়ের পর যদি চেকারদের নজরে পড়ে যায়—এমন কালো-হিরের মতো দুর্লভ একটা জিনিস—তাহলে কি আর সে-জিনিস না হাতিয়ে তারা—মানে বিশ্বাস তো নেই কিলবিল করছে চারপাশে সব চোর-ডাকাতেরা—

এটাই হল লাখ-কথা এক-কথা। কথাটা মনে ধরে ঝুমকির। সত্যি চোর-ডাকাতদের মতো হীরে-জহরতের জহুরি আর কারা আছে। কথায় বলে রতনে-রতন-চেনে। নাঃ উপমাটা বোধহয় লাগসই হল না। সে-রকম রতন কুট্টুস মোটেই নয়। ডাকাতি করতে কেউ ওকে কখনও দ্যাখেনি—এমনকি যুধিষ্ঠির রায়ও ওকে ছিঁচকে-চোর বলতে পারবে না—তবে যেদিন বাজার থেকে পাবদা কিংবা ইলিশ আসে, সেদিন একটু ভেবেচিন্তে দ্যাখে ঠোঁট-টোট চাটা যায় কিনা।

ঝুমকি বলে,—তাহলে কুট্টুস যাচ্ছে না; গোপালপুর আমারও তাহলে যাওয়া হচ্ছে না মা।

অনেক বোঝায় রমা। শেষে ঠিক হয় অত্যন্ত গোপনে নিয়ে যাওয়া হবে কুট্টুসকে প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে ভরে—ভিতরে মাছ রেখে দেওয়া হবে, যাতে টুঁ শব্দটি না-করে, মানে না-করতে হয় ওকে। ঝুলি মানে থলে থেকে বেড়াল বেরুবে সেই বেরহামপুর স্টেশনে পৌঁছে। থলির মধ্যে কুট্টুসকে ভরার দায়িত্ব রইল ঝুমকিরই।

কিন্তু কোথায় কুট্টুস। এই পায়ে-পায়ে ঘুরছে। গায়ের সঙ্গে গা ঘষছে, কিন্তু জিনিসপত্তর যেই বাঁধাছাঁদা হয়ে গেল অমনি তার আর কোনও পাত্তা নেই। শেষ অবধি কুট্টুসবিহনেই তাদের রওয়ানা দিতে হল গোপালপুর। রমা বিড়বিড় করে বলেন,—এ কেমন আক্কেল বুঝতে পারছি না। এই এতক্ষণ পায়ে-পায়ে ঘুরছে, যেই জিনিসপত্তর বাধাছাঁদা হয়ে গেল অমনি হাওয়া—

উদ্গত কান্না চেপে বলে ঝুমকি,—বুঝতে পারলে না কেন ভ্যানিশ? তোমাকে মুখবন্ধ প্লাস্টিকের থলের মধ্যে ভরে নিয়ে গেলে তুমি যেতে? আত্মসম্মান সবারই আছে মা।

তাও হয়তো গোপালপুরের নীল-সমুদ্র দর্শন করে কুট্টুস হারানোর ব্যথা ভুলতে পারত ঝুমকি, কিন্তু তারও তো ছাই উপায় নেই—

সকালবেলা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে সমুদ্রে দেখছিল ঝুমকি। হঠাৎ কিছুটা দূরে মেঝেতে চোখ পড়তেই অবাক ঝুমকি। বারান্দার রেলিংয়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে আছে কুট্টুস। সেই আলকাতরায় চোবানো চেহারা—কোথাও একটু সাদা ছোপ অবধি নেই—একদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। কী আশ্চর্য! কুট্টুস আসবে কী করে এখানে? দুহাত দিয়ে চোখ কচলায় তারপর নিজের গায়ে জোরে চিমটি কাটে। নাঃ বেশ ব্যথা লাগছে। তাহলে তো

জেগেই আছে সে। তাহলে সামনে গ্যাট হয়ে বসে যে দেখছে ওকে, সে কি কুট্টুসই? উঠে দাঁড়িয়ে ডাকে ঝুমকি,—আয় কুট্টুস, আয়। ডাক শুনেই বেড়ালটা উলটোমুখে ছুটে পালায় আর তখন দ্যাখে ঝুমকি ওর লেজের ডগায় একটু সাদা ছোপ। অর্থাৎ একেবারে খাঁটি কুট্টুস নয় ও। একটু ভেজাল মেশানো। কিন্তু তাতে দুঃখে নেই ঝুমকির। কলকাতায় কুট্টুস আর গোপালপরর কুট্টুস এক হয় কখনও! সবারই কি ভুশুণ্ডী কালো হওয়া ভাগ্যে থাকে? কিন্তু আপাতত তো ওকে নিয়েই দিব্যি কাজ চলে যেতে পারে ঝুমকির। বেড়াল ছাড়া কোনও সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ কি বাঁচতে পারে? একটা দিন যে কী কষ্টই গেছে ঝুমকির। বাকি কটা দিন কী করে কাটাবে এখানে তাই ভাবছিল। যাক ভগবান মুখে তুলে চেয়েছেন। সবচেয়ে আনন্দের কথা, ওটার হাবভাব দেখেই বুঝে গেছে ঝুমকি—কুট্টুসের মতোই হ্যাংলা, ছোঁক-ছোঁক স্বভাব ওর। আর একটু ভালো-মন্দ খাওয়ার জন্য যদি নোলাই না-থাকে তাহলে কিসের বেড়াল? তাহলে তো বাবা মঠে-মসজিদে গিয়ে থাকলেই হয়। কিন্তু আয়-আয় বলে ডাকতে বেড়ালটা পালাল কেন? আজ অবধি যত বেড়াল দেখেছে ঝুমকি, আয়-আয় শব্দটার মানে সবাই দিব্বি বোঝে। ডাকলেই লেজ-ফুলিয়ে গরগর শব্দ করতে-করতে গায়ের কাছে এসে গা ঘষতে থাকে। কিন্তু এ-বেড়ালটা দেখতে কুট্টুসের মতো হলে কী হবে—বুদ্ধি তার ছিটেফোঁটাও পায়নি—না-হলে আয়-আয় ডাক শুনে কেউ এমন তড়িঘড়ি পালায়? বিকেলে মন খারাপ করে বসে আছে ঝুমকি, হঠাৎ দ্যাখে সেই বেড়ালটা ঘাপটি মেরে বসে আবার দেখছে ওকে। এবার বুঝে গেছে ঝুমকি। হয়তো একটু সেন্টিমেন্টাল ধরনের বেড়াল—আদরে বড় হয়েছে। একটু নরম-গলায় ডাকতে হবে। কাছে গিয়ে আস্তে মৃদু-গলায় ডাকে—আয় বাবা আয়। ডাকটা শোনামাত্রই বেড়ালটা পতাকার মতো লেজটা তুলে চোঁ-চোঁ দৌড়, তারপর দোতলার বারান্দা থেকে একেবারে ট্রাপিজের খেলোয়াড়ের মতো সোজা ঝাঁপ নিচে—হাত-পা ভাঙল কিনা কে জানে।

আর পারে না ঝুমকি। হাউহাউ করে গিয়ে কেঁদে পড়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে। গোপালপুর আর একসেকেণ্ডও নয় বাবা—এক্ষুনি ফিরে চলো—এক্ষুনি—

—কেন রে? কি হল? এই বলছিলি এখানকার সমুদ্র খুব সুন্দর। কি ঝকঝকে, নীল রংয়ের ঢেউ আর কী সুন্দর জাহাজ।

—সমুদ্র দিয়ে ছাই হবে। এখানকার বেড়ালগুলো একেবারে অশিক্ষিত জংলি-ভূত বাবা। আয়-আয় কথাটারও মানে বোঝে না। এখানে থাকা যাবে না বাবা। চলো জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবে এক্ষুনি—

বাবার হাত ধরে টানতে থাকে ঝুমকি।

—আরে দাঁড়া-দাঁড়া। যাব বললেই হুট করে চলে যাওয়া যায় ? আর ব্যাপারটা নিয়ে একদিন ভাববার সময় দিবি তো অন্তত। কেন এই বেড়াল আয়-আয় মানে বুঝতে পারছে না।

—বেশ। এই একটা দিনই সময় বাবা, কাল আমি আর গোপালপুর নেই। ওই এসেছে আবার বাবা মুখ্যুটা, এই আয় তো এদিকে—আয়-আয়—

আর আয়-আয়-আয়। বেড়ালটা লেজ তুলে এবার দৌড় মেরেছে রান্নাঘরের দিকে।

পরদিন যুধিষ্ঠির বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখছে। ঝুমকি চেয়ার নিয়ে বসল কাছে।

—কি ডিয়ার ফাদার, বেড়ালটার এরকম বেচালের কারণ কিছু বোঝা গেল!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ ব্যাপারটা খুবই পরিষ্কার ঝুম। গোপালপুর জায়গাটা উড়িষ্যার ভিতরে হলে কী হবে, এখানে সবাই শুধু তেলুগু বলে দেখেছিস—তেলুগু ভাষাভাষি লোক এখানে বেশি।

—হ্যাঁ, তাতে কী হল।

—ওই বেড়ালটাও তেলুগু-বেড়াল ঝুম। বাংলা বুঝবে কী করে ও?

—ওঃ বাব্বা—প্রায় গর্জন করে ওঠে ঝুমকি,—বেড়াল আবার তেলুগু হয় নাকি?

—হয় না মানে? কী বলতে চাস? সব বেড়ালই বাঙালি নাকি যে আয়-আয় বুঝবে? মিনমিন করে বলে যুধিষ্ঠির,—যদি ভেবে থাকো তাহলে সেটা তোমার মারাত্মক ভুল ঝুম।

—তাহলে এবার কী করণীয় আমার

—দ্যাখো যদি বাংলাটা শেখাতে পার ওকে—

—তার চেয়ে আমারই তেলুগু শেখা অনেক সহজ বাবা।

—কী জানি বাপু মুখে মার্বেল নিয়ে কী-যে সব বলে বুঝি না। দ্যাখো তবু চেষ্টা করে। চেষ্টার অসাধ্য কী আছে!

কী বিপদেই যে পড়েছে ঝুমকি। তেলুগু শেখা চাট্টিখানি কথা? কী যে হাড্ডুল-মাড্ডুল সব বলে যায় তার একবর্ণও বোঝে না ঝুমকি। একশ বছর থাকলেও বোধহয় তা বুঝতে পারবে না। অথচ এখানে আছে ওরা আর মোটে দিন সাতেক। তাহলে ওই বেড়ালটার সঙ্গে একটা বাক্যবিনিময় না-করেই গোপালপুর ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে। এমন শোকাবহ ঘটনাও ঘটবে তার জীবনে! বসে-বসে ভাবছে এইসব হঠাৎ পিছনে একটা কোলাহল হইহই শব্দ। একটি ছোট মেয়ে কাকে 'মা' বলে খুব জোরে ডাকছে। মা? হোটেলে আবার নতুন বাঙালি এল নাকি কেউ? পিছনে ফিরে তাজ্জব ঝুমকি। না, বাঙালি তো একেবারেই নয়। বাঙালিরা এরকম পোশাক পরে না। ধুতি লুঙ্গির মতো করে পরা দুজন পুরুষ আর পাশে তাদের গোড়ালির অনেকটা উপরে শাড়ি পরা বোধহয় মেয়েটির মা। নিঃসন্দেহে তেলুগু। তাহলে ওরাও মা-কে ডাকে মা বলেই। কী সুন্দর এই মা ডাকটা। পৃথিবীর সব ভাষাতেই মা তাহলে মা-ই। ঝুমকিকে আর পায় কে? বেড়ালটা কখন আবার যথারীতি গুটিসুটি মেরে রেলিংয়ের গা ঘেঁষে বসেছে এতক্ষণে চোখে পড়ে ঝুমকির। ঝুমকি ডাকে—আয় মা আয়। মা কথাটা নিশ্চয়ই বুঝবে তেলুগু-বেড়ালটা।

ঝুমকি অবাক হয়ে দ্যাখে পায়ে-পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে গোপালপুরের কুট্টুস। ইতিমধ্যে বারান্দায় কখন এসে পড়েছে যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির বলে,—আহ্ ঝুম, ওটা একেবারে সেন্টপার্সেন্ট হুলো। ওটাকে মা বলে ডাকছ কোন আক্কেলে? ব্যাকরণের স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ এবার কে গুলে খেয়েছ দেখো?

—এটা তুমি বুঝবে না বাবা, এটা হল গৌরবার্থে স্ত্রীলিঙ্গ।

অ্যাঁ—চোখ কপালে ওঠার দশা যুধিষ্ঠিরের। হতভম্বের মতো বলে,—কই এটা তো আমরা ব্যকরণে পড়িনি ঝুম। এটা বুঝি নতুন ঢুকেছে তোদের কোর্সে!

—ভেবে দেখতে হবে বাবা কোথায় পড়লাম—যুধিষ্ঠির কি-বলতে যাবে তার আগেই ব্ল্যাক-জাপানের পোঁচ-দেওয়া বেড়ালটা লেজ তুলে ঝুমকির পায়ে গা ঘষতে লেগেছে কলকাতার কুট্টুসের মতো। মুখে সেই গরগর শব্দ। ঝুমকি অবাক। মা ডাকটা যেমন সর্বত্র এক, তেমনি এই গরগর শব্দটা। সত্যি কী সুন্দর যে আজ গোপালপুরের সমুদ্রটা।

বেড়ালটার ঘাড়ে হাত ঘষে কলকল করে বলে ঝুমকি,—বাবা আজ কিন্তু চিতল মাছের একটা একস্ট্রা পেটি—এটার কিন্তু কোনও স্ত্রীলিঙ্গ-পুংলিঙ্গ নেই।

ছবি ঃ প্রবীরকুমার সামন্ত

বগলা অ্যান্ড কোং
জুরান নাথ
এই দ্যাখো! টুপির ভিতরে একটা আধুলি ছিল! হাঃ-হাঃ
দারুণ ম্যাজিক!
বাঃ বাঃ
মাত্র বারো টাকা পঁচিশ পয়সা! ধ্যুস্! ছোটদের যাদু দেখিয়ে কোনও লাভ নেই দেখছি।
দারুণ এক আইডিয়া মাথায় গোত্তা মারছে। কী যে করি —হিঃ-হিঃ!
তারপর
অদ্ভুত লোকটা!!
হুম্! ওই ছোকরাকেই কাজে লাগাতে হবে!
অ্যাঁ! হুমদোটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে কেন?
তাকাও আমার দিকে তাকাও! সব ভুলে যাও! শুধু আমি যা বলব তুমি শুনবে! তাকাও—
আজ্ঞা করুন প্রভু!!!
হাঃ, সম্মোহনে কাজ হয়েছে। এবার যা বলছি মন দিয়ে শোন! তুমি করবে!
বলুন প্রভু!!

একটু পরেই
টাকার ব্যাগটা চাই!!
সে-সেকিরে ব-বগলা! তু-তুই!!
আরেকজন
টাকাটা দিন
আবার
টাকার ব্যাগ! হারি আপ্!!
পরদিন
সন্ধান চাই। খুনে-ছিনতাইকারী।
চারিদিকে পোস্টার মেরে দিলুম! ব্যাটা পালাবে কোথায়?
কদিন ধরে বগলাদার কোনও—
অ্যাঁক্—প-পটলা! দেখেছিস?
সন্ধান চাই। খুনে-ছিনতাইকারী।
সর্বনাশ! কী দেখছিরে বদু! বগলাদা শেষে এই পথ নিল।
সত্যি। বগলাদা ছিনতাই করছে ভাবতেই—
সন্ধান চাই। খুনে ছিনতাই কারী।

পরের সংখ্যায় শেষ

চাই! চাই না!

এবারের বিতর্ক "শিক্ষকদের কি প্রাইভেট টিউশন করা উচিত"

বয়েসটাই তো চুটিয়ে তর্ক করার—হাল্কা থেকে গভীর সবরকম বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতের দেওয়া-নেওয়া করার। আশেপাশে যা দেখছি, তেমনই সব বিষয় উঠে আসছে এই বিভাগে—যুক্তি দিয়ে আমাদের পাঠক-পাঠিকাবন্ধুরা কলম নিয়ে লড়ে যাবে—নাঃ, এই আসরে সম্পাদক কিচ্ছু বলবেন না!

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়, আজকাল অর্থের মূল্য সবচেয়ে বেশি। ওই সব সততা, ন্যায়পরায়ণতা নির্ভীকতার মূল্য শুধু উপদেশাবলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবুও যাঁরা মূর্খ তাঁরাই কেবল ওই পথে যান। তবে বেশির ভাগই যে জোয়ারের অনুকূলে একথা বলার চেয়ে না বলাই বোধহয় শ্রেয়। এখন মাননীয় শিক্ষকগণ যদি আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধির চেষ্টায় নিজেকে আন্তরিকভাবে নিবেদিত করতে সচেষ্ট হন তাহলে অবশ্যই শিক্ষকের টিউশন করা উচিত। সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে দুর্নীতি যেখানে সহজলভ্য, সেখানে শিক্ষকগণ অতিরিক্ত শিক্ষাদানের নাম করে যদি ট্যাক্স ফ্রি কিছু টাকা আয় করেনই তাতে দোষেরই বা কি আছে? চুরি-টুরি তো করছেন না! হয়তো একটু ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছেন, আবার হয়তো-বা স্কুলে গিয়েও ক্লাস না নিয়ে বাড়ির ছাত্রদের নোটস তৈরি করছেন। তাতে তো খুব একটা দোষ খোঁজা উচিত নয়। কেননা ওঁরা যা কিছু করছেন সবই তো ছাত্রদের জন্যেই করছেন। কী বলেন সম্পাদক মশায়?

শান্তনু আচার্য
নদীয়া, ৭৪১১৬০

বিদ্যালয়ের সীমিত সময়ে সমস্ত কিছু শেখানো একজন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব নয়। তার ওপর বিদ্যালয়ে প্রায় প্রতিদিনই কোনও- না-কোনও উপলক্ষে ছুটি থাকে। তাই ছাত্ররা বাধ্য হয় গৃহশিক্ষকের দ্বারস্থ হতে। আর শিক্ষকদের উদ্দেশ্য যেহেতু জ্ঞান দান করা এবং বর্তমানে যখন 'Give and take' পদ্ধতি বহুল প্রচলিত, তাই তাঁরা কিছু পারিশ্রমিক নেন জ্ঞানদানের বিনিময়ে। তাই এতে কোনও অপরাধ নেই। কিন্তু যদি তারা তাদের সমস্ত ধ্যান জ্ঞান প্রাইভেট কোচিং-এ লাগান তবেই বিপদ। উপরন্তু আরও একটা বিষয় আছে। গরিব ছাত্ররাও নিশ্চয়ই আরও অনেকের মতো ৭-৮টা শিক্ষক নিতে পারে না। কিন্তু তাদের কী তার প্রয়োজন নেই? আছে। তাই যদি শিক্ষকেরা গরিব ছাত্রদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করে, বিদ্যালয়ে ঠিকঠাক পড়িয়ে, তারপর গৃহশিক্ষকতা করেন তাহলে ক্ষতি কীসের? বর্তমানে 'শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধ' বলে নিয়ম হয়েছে। কিন্তু, তাহলে ছাত্ররা পড়বে কোথায়? যারা নিয়ম তৈরি করেছেন তাঁদের কাছে? তারাও তো আসল কাজ অর্থাৎ, পরিকাঠামোর Change ঘটানো-টাই ঠিক মতো করতে পারেন না, তাহলে তাদের কী হবে? তাদেরকে চাকরি থেকে কী বহিষ্কার করা হবে? না। এমনটা করা হবে না, বরং ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করে 'দেবতা' সমান শিক্ষকদেরকেই যত শাস্তি দেওয়া হবে। তাই পরিকাঠামো, শিক্ষাব্যবস্থা, স্কুল পরিদর্শক এবং প্রধান শিক্ষকদের সচেতন করতে হবে যাতে শিক্ষকেরা স্কুলে ঠিকমতো পড়ান। তারপর তাদের গৃহশিক্ষকতা করতে দেওয়া উচিত, কারণ দেশের ভবিষ্যত চালকের তো তারাই গড়ে তুলবেন, তাই না?

স্বরূপ কুণ্ডু
বর্ধমান, ৭১৩১৩০

খুব সম্প্রতি যে প্রসঙ্গটি ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহলকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলে প্রশ্নের ঝড় উঠিয়েছিল এবং যাকে নিয়ে চাপান-উতোর চাপান শুরু হয়েছিল সেটি হল শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের প্রসঙ্গ।

ব্যক্তিগতভাবে একজন ছাত্র হিসাবে আমি প্রাইভেট কোচিং এর পক্ষে। আমার এই মতামতের পিছনে যেসব বাস্তব কারণ রয়েছে সেগুলিকে উন্মোচিত করছি, বোধকরি তাতে, বিষয়টি স্বচ্ছ হবে।

সর্বপ্রথম বলে রাখি শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন বন্ধের অর্থই হল পড়াশুনা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজন বিদ্যালয়েই মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসার ক্ষুধাও। আর এতেই বাস্তবত সম্মুখীন হতে হয় নানান অসুবিধার।

প্রথমত, সারা বছরে বিদ্যালয়ে যে পরিমাণ সময় বা ক্লাস পাওয়া যায় এককথায় তা অপর্যাপ্ত। পুজোর ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি বা বড়দিনের ছুটিকে বাদ দিয়েও আরও কত ছুটি দেওয়া হয় তার হিসাব করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এছাড়া বিভিন্ন ক্লাসের পরীক্ষা, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময়ে তো ক্লাস বন্ধ থাকেই। এই অপর্যাপ্ত সময়ে বিশেষত উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং মাধ্যমিক স্তরে খুঁটিনাটি পড়াশুনো—ভালো করে হাতে কলমে শেখা —যে সম্ভব নয় তা যে কোনও দায়িত্বসচেতন বা সময়সচেতন শিক্ষককে এমনকি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানা যাবে। দ্বিতীয়ত, ক্লাসে পড়ানোর জন্য ধার্য সময় বড়জোর ৪০ কি ৪৫ মিনিট। এরমধ্যে রোল কল, আসা যাওয়া এতেও বেশ কিছু সময় ব্যায়িত হয়। আর বাদবাকি সময়ে কি করা বা করানো সম্ভব তা ওই অবস্থার মুখোমুখি ছাত্র বা শিক্ষকরা হাড়ে হাড়ে টের পায়। তৃতীয়ত, অপরিমিত শিক্ষক-শিক্ষিকা। অপর্যাপ্ত সময়ে, খাঁটি বাস্তবের নিরিখে, ৭০-৮০ জন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে কমিউনিকেট করাটা এবং তাদের নিজ-নিজ পড়াশুনা বিষয়ক সমস্যার সমাধান করা কতবড় অসম্ভব কাজ তা বলাই বাহুল্য। কাউকে কোনওরকম অশ্রদ্ধা না করে বলতে বাধ্য হচ্ছি একটা বাস্তব সত্য—বেশিরভাগ শিক্ষক-শিক্ষিকা কমিউনিকেটর হিসাবে অত্যন্ত খারাপ। চতুর্থত, উপবেশন স্থানের অভাব। শ্রেণীকক্ষের অভাব। পঞ্চমত, ক্লাসে উপস্থিত সব ছাত্র-ছাত্রীর মেধাও তো সমতুল নয়। তাই শিক্ষকরা একটা গড় গতিতে পড়িয়ে চলেন। এতে অধিক মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জানার চাহিদা অনুযায়ী বঞ্চিত হয়। আর অনেক কম মেধা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা সবকিছু ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। আর এদের সকলের আশা পূরণ শিক্ষকের পক্ষে স্কুলে বসে সম্ভব নয়। কেননা, অত সময় কোথায়?

ষষ্ঠত, রাজ্যে শিক্ষার মান পড়ে যাচ্ছে এই অভিযোগে শিক্ষকদের প্রাইভেট কোচিংকে দায়ী করে তা বন্ধ করা হল। কিন্তু প্রাইভেট টিউশন বন্ধ হলেই কি ক্লাসে শিক্ষার মান উন্নত হয়ে যাবে? তার উপযুক্ত ব্যবস্থা কি আদৌ আছে? কোনও শিক্ষক স্বেচ্ছায় ক্লাসে ভালো করে না পড়ালে শুধু প্রাইভেট টিউশন বন্ধ করে কি হবে? প্রসঙ্গত বলি, যে সব শিক্ষক-শিক্ষিকারা ভালো পড়াতেন, ছাত্রেরা তাদের কাছেই পড়তে যেত। অন্যথায় নয়। আর ভালো পড়ানো যাঁদের অভ্যাস। তাঁরা সর্বত্রই ভালো পড়ান—কি ক্লাসে কি কোচিং সেন্টারে। উলটো করে বলা যায়, ক্লাসে যাঁরা ভালো পড়ান তাঁদের বেশিরভাগই টিউশন করতেন। যেটা মূল অভিযোগ, কোচিং সেন্টারে ছাত্র-ছাত্রী পেতে ক্লাসে ভালো করে পড়াননা শিক্ষকরা। বাস্তবতার সূত্র ধরে বলি, এইধরনের শিক্ষকের সংখ্যা নগণ্য। আর টিউশন বন্ধ হলেও এরা ক্লাসে ভালো পড়াবেন না। আর কোচিং সেন্টারেও এদের কাছে ছাত্র সংখ্যা খুব বেশি নয়। কারণ, এদের মোটিভটাই ফাঁকিবাজি। এরা আলাদা এক শ্রেণীর এবং সংখ্যাতেও নগণ্য। এদের সঙ্গে কোচিং এ পড়ানো শিক্ষকদের মিলিয়ে দিলে হবে না।

কাজেই বিদ্যালয়ের নানান অসুবিধা তথা অব্যবস্থা, ছাত্রছাত্রীদের নিজ-নিজ চাহিদা এসবের জন্য তারা নিজের নিজের পছন্দের শিক্ষকের কাছে যাবে। চলবে শিক্ষার দেয়া-নেয়া। এতে সব ছাত্র-ছাত্রীদেরই যে সুবিদা হবে তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া জয়েন্ট, আই.আই.টি. বা অন্যান্য দেশব্যাপি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য কোচিং এর প্রয়োজন হয়ই। সবদেশে সবকালে (ব্যাপকহারে না হলেও) গৃহশিক্ষকতার প্রচলন অনস্বীকার্য। একান্ত শিক্ষক যাঁর কাছে খুঁটিনাটি সবকিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেওয়া যায় সেই অর্থে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন আছে।

এমতাবস্থায় গৃহশিক্ষকতা বন্ধের অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্বিপাকে কিংবা ধাঁধায় ফেলা। যেমন ভোগান্তি হচ্ছে। আর ছাত্রছাত্রীদের বেশ কিছুটা পিছিয়ে দেওয়াও।

চিরন্তন ঘোষ
বাতিকার, বীরভূম

আগামী বিতর্কের বিষয়—"ক্রিকেট কি এখন আমাদের জাতীয় খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে?" সব্বাই যোগ দাও, চিঠিও পাঠাও ২০ নভেম্বরের মধ্যে।

প্রসন্ন গুরুমশাই

বাংলা ভাষার পাঠশালা

আহাঃ, বাঃ এধরনের আনন্দ বা বিস্ময়বোধক, অথবা উঁহুঃ, ছিঃ, নাঃ এরকম অসম্মতি বা বিরক্তিসূচক উচ্চারণ বোঝাতে আমরা লিখিত শব্দের শেষে বিসর্গ বসাই। খাঁটি বাংলায়—মানে অতৎসম শব্দে—বিসর্গের ব্যবহার মোটামুটি এটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু তৎসম বা সংস্কৃত শব্দে বিসর্গের ব্যাপক আধিপত্য। মন অন্ত অধ চক্ষু জ্যোতি প্রাত বক্ষ শির ছন্দ যশ স্বত এসব নানা শব্দ সংস্কৃতে বানান করা হয় বিসর্গ দিয়েই (মনঃ অন্তঃ...), যদিও বাংলায় আমরা সেই বিসর্গ বাদ দিয়েই লিখে থাকি। তবে সেই বিসর্গের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় যখন লিখতে হয় মনঃকষ্ট অন্তঃকরণ অধঃপাত প্রাতঃকাল শিরঃপীড়া স্বতঃপ্রবৃত্ত এসব বানান। আবার এই বিসর্গ অন্যরূপেও দেখা দেয় কখনও ও-কার হয়ে (মনোযোগ), কখনও রেফ হয়ে (জ্যোতির্ময়), কখনও শ হয়ে (শিরশ্ছেদ), কখনও ষ হয়ে (চক্ষুষ্মান), কখনও স হয়ে (যশস্কর) এমনি নানাভাবে।

তবে শব্দের শেষের বিসর্গটি বাংলায় অনেকদিন ধরেই বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। মন চক্ষু ছন্দ এমন সব শব্দ ছাড়াও আরও যে সমস্ত শব্দ থেকে অন্ত্য বিসর্গ ছেঁটে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে—অংশত অন্তত অন্তস্থ (= শেষের) ক্রমশ প্রায়শ ফলত বশত বস্তুত মুখ্যত মূলত আপাতত প্রথমত দ্বিতীয়ত তৃতীয়ত বিশেষত স্বভাবত সাধারণত...। এই রকম অন্ত্য বিসর্গহীন অন্য শব্দের উদাহরণ হল ঃ অহরহ ইতস্তত পুনঃপুন মুহুর্মুহু।

সংস্কৃতে যেসব শব্দের মধ্যে বিসর্গ আছে সেগুলো বির্সজন দেওয়া যায় না, কিন্তু সংস্কৃতেই বিধান আছে কয়েকটি শব্দের বেলায় বিকল্পে বিসর্গটি বর্জিত হতে পারে। তেমন শব্দের নমুনা হল দুস্থ নিশ্বাস নিস্তব্ধ নিস্পন্দ নিস্পৃহ বয়স্থ বহিস্থ মনস্থ চক্ষুশূল বক্ষস্থল।

এবার বিসর্গ বিশিষ্ট শব্দের একটা তালিকা পেশ করা যাক ঃ দুঃখ দুঃখী নিঃস্ব দুঃখিত দুঃখিনী দুঃসহ নিঃশব্দ নিঃশেষ নিঃসঙ্গ নিঃসাড় নিঃস্বার্থ অন্তঃপাতী অন্তঃপুর উচ্চৈঃস্বরে নিঃসরণ নিঃসহায় প্রাতঃকৃত্য মনঃপূত সদ্যঃস্নাত স্বতঃস্ফূর্ত অধঃপতন অন্তঃসলিলা দুঃসাহসিক পয়ঃপ্রণালি অন্তঃসারশূন্য প্রাতঃস্মরণীয় মনঃসমীক্ষণ সর্বান্তঃকরণ। এখানে বলে রাখা ভালো, মা ভৈঃ আর শনৈঃ শনৈঃ শব্দে বিসর্গ বাদ দেওয়া চলবে না। তেমনি মনে রাখতে হবে ওতপ্রোত আর স্বর্গত শব্দে বিসর্গ নেই।

বাংলায় বিসর্গের একটু অন্যধরনের ব্যবহারও প্রচলিত আছে। কোনো শব্দের সবটা না-লিখে সংকেতে লেখার সময় আদ্য অক্ষরটিতে অনুস্বার বা বিসর্গ লাগানোর রেওয়াজ দেখতে পাওয়া যায়, যেমন তারিখ-এর জায়গায় তাং অথবা ডাক্তার-এর জায়গায় ডাঃ। ওইরকম ডক্টর মিস্টার জাতীয় শব্দকে সংক্ষেপ করে ডাঃ মিঃ লেখা হয়। বিঃএ এমঃএ এমঃএলঃএ লিখতেও দেখা যায়। কিন্তু এখন ওই বিসর্গ উঠিয়ে সেখানে ডট বা বিন্দু বসানোর রীতি গৃহীত হয়েছে। তাই ড. ডা. মি. বি. এ এম.এ এম.এল.এ লেখা হচ্ছে।

অনেক সময় কোলন (ঃ)-এর জায়গায় বিসর্গ (:) বসানো হয়ে থাকে। ওটা ঠিক নয়। তাই এমন লেখা উচিত হবে—নদী, যেমন : গঙ্গা।

বিসর্গ নিয়ে অনেক কথা হল, এবার হস্‌-চিহ্ন নিয়ে একটু বলে নেওয়া যাক।

সাধারণত ব্যঞ্জনান্ত উচ্চারণ বোঝাতেই হস্‌-চিহ্নের ব্যবহার করা হয়। সংস্কৃতে এইসব শব্দের বানান হস্‌ দিয়ে লেখা বিধেয় হলেও বাংলায় বহুকাল ওই চিহ্ন বর্জন করা হয়েছে—দিক ধিক বাক প্রাক আপদ আশিস পর্ষদ পৃথক বণিক বিদ্বান বিপদ বিরাট ভিষক মহান সম্রাট পরিষদ সভাসদ। তবে সন্ধি বা সমাসের ক্ষেত্রে এসব শব্দের হস্‌চিহ্নবিশিষ্ট বা হসন্ত বানানের কথাটা মনে রাখতে হয়। তাই দিগ্‌বলয় ধিক্কার বাগ্দেবী প্রাক্কাল পৃথককরণ প্রাক্কথন বাক্‌সর্বস্ব বিপজ্জনক। সেইমতো শ্রীমান বুদ্ধিমান শক্তিমান রুচিমান সংস্কৃতিমান জ্ঞানবান ধনবান বলবান ভগবান ভাগ্যবান মূল্যবান রূপবান বানানও হস্‌চিহ্ন ছাড়াই লেখা হয়। ষড়যন্ত্র শব্দটা হস্‌চিহ্ন বাদ দিয়ে ষড়্‌যন্ত্র বানানে লেখাটা পণ্ডিতেরা মেনে নিয়েছেন।

বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দে হস্‌চিহ্ন দেওয়ার প্রথাও ক্রমে উঠে গেছে। ছলাত ধপাস টুপটাপ দুপদাপ এধরনের বানানে এখন আর হস্‌চিহ্ন লাগানো হয়না। এমনকী কবজা কবজি ফুলকি হালকা আলপনা প্রভৃতি শব্দের মধ্যেও হস্‌ দেওয়ার দরকার হয়না।

বাংলা ক্রিয়াপদেও অযথা হস্‌ প্রয়োগ করা হয় না। করছি করিস দেখল দেখবি এমন ধরনের শব্দের বানানে হস্‌চিহ্ন অনাবশ্যক। তবে বর্তমান অনুজ্ঞায় তুমি-পক্ষের (মধ্যমপুরুষের) তুচ্ছার্থক প্রয়োগে কোনও কোনও জায়গায় হস্‌চিহ্ন লাগানোর দরকার হতে পারে, যেমন—আন্‌ কর্‌ পড়্‌ বোস্‌। নইলে নিত্য বর্তমানকালের (তুমি/তোমরা) আন কর পড় বোস-এর সঙ্গে তফাত করার অসুবিধে দেখা দিতে পারে।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

যাঁদের ভুলতে চাই না

দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ রচনার কারিগর হবেন আমাদের কিশোর বন্ধুরা। পৃথিবীর অতীত ইতিহাস থেকে বন্ধুদের তাই শিক্ষা নিতেই হবে। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নানা প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রত্যয়ী চরিত্র এই বাংলাদেশে কম নয়। স্মৃতির পাতা থেকে অমলিন সেই মানুষদের কথা লিখছেন

শ্যামল চক্রবর্তী

'আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনও আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাত আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ রেখে দিয়েছেন যে মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।'

এমন কথা যিনি বলতে পারেন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত না হয়ে উপায় নেই। কে তিনি? বাংলা ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির নিপুণ বিশ্লেষক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।

এপার বাংলায় চব্বিশ পরগণার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার পেয়ারা গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। জন্ম তারিখ ১০ই জুলাই, ১৮৮৫। পিতা মুনশী মফিজুদ্দীন আহমদ হাওড়া জেলার রেজিস্ট্রেশন অফিসে কাজ করতেন। টিকিয়াপাড়ায় নিজেদের বাসাবাড়ি ছিল। সেখানেই থাকতেন। মফিজুদ্দীনের তিন মেয়ে চার ছেলে। শহীদুল্লাহ্ ছিলেন ষষ্ঠ সন্তান। জন্মের একুশ দিন পর যখন নবজাতকের নাম দেওয়া হয় তখন তিনি মুহম্মদ ইব্রাহিম নামে পরিচিত হন। কেউই তাঁকে এই নামে চেনেন না। মায়ের দেওয়া নাম মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ই সারা দুনিয়া জুড়ে খ্যাতিলাভ করেছে।

গ্রামের পাঠশালাতে শহীদুল্লাহের লেখাপড়া শুরু হয়। তিনি নিজেই পরে লিখেছিলেন, '...কত বয়সে তা মনে নেই। এই পাঠশালায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম ভাগ, দ্বিতীয়ভাগ, কথামালা ও বোধোদয় পড়েছিলাম বলে মনে আছে।'

দশ বছর বয়সে শহীদুল্লাহ্ হাওড়ায় বাবার কাছে চলে এলেন। হাওড়ার বেলিলিয়াস এম. ই. স্কুলে দু'বছর পড়েন। তারপর পঞ্চাননতলা এম. ই. স্কুল থেকে মাইনর পাশ করেন। ১৯০০ সালে তিনি হাওড়া জিলা স্কুলে ভর্তি হন। 'স্কুলের মৌলভী সাহেবের মারের ভয়ে ফার্সী না নিয়ে' তিনি সংস্কৃত নিয়েছিলেন। স্কুলে বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত পড়তেন। বাড়িতে বসে ফারসী, উর্দু, হিন্দি ও উড়িয়া ভাষা শিখেছেন। '...ঘুড়ি ওড়ানো, লাটিম ঘোরানো, মারবেল খেলা...না করে আমি ভাষা শিক্ষা করতাম।'

পড়াশুনোয় শহীদুল্লাহ্ বিশাল মেধাবী ছিলেন না। আবার কখনও লেখাপড়া করতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হননি। মাস্টারমশাই 'নারিকেল গাছ' নিয়ে রচনা লিখতে দিয়েছেন। এমন লিখেছিলেন সেসময়, মাস্টারমশাই বিশ্বাস করতেই পারেননি। মনে রাখতে পারতেন ভাল। ক্লাশে প্রথম না হলেও সংস্কৃত পরীক্ষায় তিনি সবসময়ে সবার উপরে নম্বর পেতেন। 'দিলরুবা' কাগজের পৌষ ১৩৬৭ সংখ্যায় চমৎকার লিখেছিলেন শহীদুল্লাহ্, "হিন্দু সহপাঠিদের সাথে গলায় গলায় ভাব ছিল। তারা একদিন পণ্ডিত মশায়কে খেপাবার জন্য এক নালিশের অভিনয় করে। তারা বলে, 'স্যার, আমরা বামন-কায়েতের ছেলে থাকতে আপনি ওই মুসলমান ছেলেটাকে বরাবর ফার্স্ট করে দেন, এতে আপনি অন্যায় করেন।' তাতে তিনি বলেন, 'আমি কি করব, ও সিরাজুদ্দৌলা লেখে ভাল, তোরা ত তেমন লিখতে পারিস না।' পণ্ডিতমশাই আমার নাম মনে রাখতে পারতেন না, তাই আমাকে সিরাজুদ্দৌলা বলতেন।"

১৯০৪ সালে হাওড়া জিলা স্কুল থেকে শহীদুল্লাহ্ এনট্রান্স পাশ করেন। পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজের এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন এই দেশের সেরা মনীষীরা পড়াতেন। ভাষাচার্য হরিনাথ দে ছিলেন। ১৪টি বিষয়ে এম. এ. পাশ করেছিলেন। এদেশের ও বিদেশের ভাষা মিলিয়ে ৩৪টি ভাষা জানতেন। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের দুই খ্যাতিমান অধ্যাপক সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াতেন। একজন অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন ঘোষের অগ্রজ ছিলেন মনোমোহন। অন্যজন অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। তিনি বিখ্যাত জাতক-অনুবাদক ঈশানচন্দ্র ঘোষের পুত্র ছিলেন। প্রায় চারদশক

প্রেসিডেন্সিতে পড়িয়েছেন। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন খগেন্দ্রনাথ মিত্র। পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক' পদে বৃত হন। তোমাদের জন্যে বলছি, 'ভোম্বল সর্দার' বই লিখে যিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন তিনি কিন্তু এই খগেন্দ্রনাথ মিত্র নন। বিজ্ঞান জগতের দুই দিকপাল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুও সে সময় প্রেসিডেন্সিতে অধ্যাপক ছিলেন।

১৯০৬ সালে শহীদুল্লাহ্ এফ. এ. পাশ করেন। অধ্যাপক হরিনাথ দে তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বদলি হয়ে হুগলি কলেজের প্রিন্সিপাল পদে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উপদেশে শহীদুল্লাহ্ হুগলি কলেজে ভর্তি হন। ইংরেজি ও সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পড়তে শুরু করেন। মাস্টারমশাই তাঁকে শুধু সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পড়তে বলেন। পড়লেনও তিনি। ম্যালেরিয়া হয়ে যাওয়ায় পরীক্ষা দিতে পারলেন না। যশোর জিলা স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি নিয়ে চলে যান। ১৯০৮ ও ১৯০৯—এই দু'বছর পড়ান।

১৯০৯ সালে তিনি প্রাইভেটে বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন। পাশ করেছিলেন সব বিষয়েই। এগ্রিগেটে এক নম্বর কম ছিল। তাই পাশ মার্কসীট পেলেন না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে শহীদুল্লাহ্ দেখা করেন। আলাপ আলোচনায় ছেলেটিকে ভালো লেগে যায়। এই ছেলে ফেল করবে কি! আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে শিক্ষকতার চাকুরি ছেড়ে দিতে বলেন। কলেজে ভর্তি হয়ে রেগুলার ছাত্র হিসেবে পড়তে বলেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে না এলে হয়তো ওই স্কুলের গণ্ডিতে তিনি জীবন কাটিয়ে দিতেন। স্কুল শিক্ষকতা ছোট কাজ নয়। তবু কেউ যদি অন্ধকার কুঠুরি খোঁজে জ্ঞান ভাণ্ডারের মণি মাণিক্যের সন্ধান দিতে পারেন তাঁকে সেই পথের পথিক হওয়াটাই কি সমীচীন নয়? আশুতোষের অবদান তিনি জীবনে কখনও ভোলেন নি। তাঁর লেখা একটি বই তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছেন।

১৯০৯ সালেই কলেজে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে শহীদুল্লাহ্ বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। ১৯১০ সালে বি. এ. পাশ করেন। খুব ভাল ফল করেছেন এমন নয়। তবে বেদের প্রশ্নপত্রে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে তিনিই প্রথম সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে পাশ করেছিলেন।

শহীদুল্লাহ্ আরও পড়বেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একসঙ্গে আইনবিদ্যা ও সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম পড়তে চাইলেন। ভর্তিও হন তিনি। মাস তিনেক পর যেই পণ্ডিত বেদ পড়াবেন, তিনি বেঁকে বসলেন। মুসলমান ছেলেকে, যত ভালোই তিনি হোন, বেদ কিছুতেই পড়াবেন না। উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিজে পণ্ডিতমশাইকে অনুরোধ করেন। ছেলেরা আন্দোলন শুরু করে। নানা কাগজে এর বিরুদ্ধে লেখা হতে থাকে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ক্লাসের ছাত্র। তিনি বলছেন, '...ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে খুব একটা আন্দোলন হয় এবং এই উপলক্ষে শহীদুল্লাহ্ ছাত্রসমাজে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। আমরা তখন তর্ক করিতাম যে খ্রিস্টান সাহেবদের সম্পাদিত ঋগ্বেদ পাঠ্য করিলে যদি দোষ না হয়, তবে ভারতীয় একজন মুসলমান বেদ পাঠ করিলে আপত্তির কি কারণ থাকিতে পারে।'

ঘটনার কথা জেনে হরিনাথ দে খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁর ভালবাসার ছাত্রটি সংস্কৃত পড়তে পারবেনা? শুধু সংস্কৃত নয়, একাধিক ভাষা জানতেন শহীদুল্লাহ্। ফারসি, উর্দু, হিন্দি, উড়িয়া, তামিল, গ্রিক ও আরও নানা ভাষার অক্ষর পড়তে পারতেন। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের একটা বিভাগ শুরু হয়েছিল। কোনও ছাত্র সেখানে ১৯১২ সাল অব্দি পড়েনি। শহীদুল্লাহ্ সেই বিভাগে ভর্তি হলেন। একা তিনি, তিনিই প্রথম, ১৯১২ সালে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম. এ. পাশ করেন।

চাকুরি থেকে ছাড়িয়ে এনে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় শহীদুল্লাহ্কে পড়িয়েছেন। উপাচার্য হয়েও তাঁকে সংস্কৃত পড়তে দিতে পারেন নি। একদিন ডেকে বললেন, 'কোথাও যদি সংস্কৃত পড়ার সুযোগ পাও আমাকে বলো। আমি সাধ্যমত সাহায্য করব।' বেশিদিন পার হয়নি। ১৯১৩ সালে ভারত সরকার জার্মানিতে সংস্কৃত পড়ার জন্য একটা ফেলোশিপ ঘোষণা করেন। শহীদুল্লাহ্ আশুতোষকে খবরটা দেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খুব ভাল সুপারিশ পত্র লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজে গিয়ে শহীদুল্লাহ্ ফেরত এলেন। ডাক্তার বললেন, শহীদুল্লাহ্ বিদেশে যাবার মত সুস্থ নন। ফলে ঠিকঠাক মেডিক্যাল রিপোর্ট দিতে পারবেন না। শহীদুল্লাহ্র অসুস্থতার খবর সত্যি ছিল না। লেখাপড়া শিখলেই যে ভেদভাব ঘুচে যায় না সে তো আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগেই দেখলাম। মেডিক্যাল কলেজেও সেদিন হয়তো তেমন ধরনের লোকই ছিলেন। মুসলমান ছেলেকে সংস্কৃত পড়তে বাইরে পাঠানো হবে? সইতে পারেন নি সেদিন ওই ডাক্তার। পঁচাশি বছর বয়েসে শহীদুল্লাহ্ সজ্ঞানে মারা যান। জীবনে খুব বেশি তিনি অসুস্থ হননি। যাই হোক, আইন পরীক্ষা তখনও শেষ হয়নি। ১৯১৪ সালের প্রথমেই তিনি আইন পাশ করেন। আইন পাশ করে চার বছর (১৯১৫-১৯১৯) তিনি বসিরহাট কোর্টে ওকালতি করেন। এই পেশায় তাঁর মন একটুও বসেনি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কথায় আবার আসি। গণিত আর পদার্থবিদ্যায় আশুতোষ এম. এ. পাশ করেন। তবে তিনি ওকালতিও পাশ করেছিলেন। হলে হবে কি। যখন বুঝতে পেরেছেন শহীদুল্লাহ্ ওকালতি করার ছেলে নন তখন ডেকে এনে দীনেশচন্দ্র সেনের সহকর্মী হিসেবে 'শরৎকুমার লাহিড়ি গবেষণা সহায়ক পদ' দান করেন। ১৯১৯ সালের ১লা জুন থেকে ১৯২১ সালের ৩১শে মে পর্যন্ত কাজ করেন শহীদুল্লাহ্। তখন সবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঢাকায় গিয়েছেন। তিনি শহীদুল্লাহ্কে ডেকে পাঠালেন। দীনেশচন্দ্র সেন মশাই জানতেন, শহীদুল্লাহ্কে ছাড়া তাঁর কাজ করতে নানা অসুবিধে হবে। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে শহীদুল্লাহ্কে রেখে দেবার কথা বললেন। উপায় ছিল না। কিন্তু আশুতোষ বলেছিলেন, যদি শহীদুল্লাহ্ থেকে যান তবে 'রামতনু লাহিড়ি অধ্যাপক' পদ ফাঁকা হলে তিনি শহীদুল্লাহ্কে আহ্বান করবেন।

১৯২১ সালের ২ রা জুন শহীদুল্লাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের লেকচারার পদে যোগ দেন। শুরুতে বছর তিন আইন বিভাগেও আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন একগুচ্ছ গুণীজনের সমাবেশ। সুশীলকুমার দে, রমেশচন্দ্র মজুমদার, হরিদাস ভট্টাচার্য, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেখানে রয়েছেন।

বছর পাঁচ অধ্যাপনার পর তিনি ফ্রান্সের বিখ্যাত সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার সুযোগ পান। ১৯২৬-২৮ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ্ সরবোনে গবেষণা করেছেন। তাঁর কাজ এতো বেশি প্রশংসিত হয়েছিল যে ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম Tris Honourable সহ ডি. লিট. ডিগ্রি পান। সেই সময় গবেষণার পাশাপাশি ফ্রান্সের একাধিক প্রতিষ্ঠানে তিনি ধ্বনিবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করেছেন। এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ধ্বনিবিজ্ঞানে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। শহীদুল্লাহের মূল গবেষণার কাজ ছিল বৌদ্ধতান্ত্রিক সাহিত্য। কতটা পড়াশুনো তাঁকে তখন করতে হয়েছে, পরিচয় পেতে চাইলে আমরা শহীদুল্লাহের লেখা থেকেই দেখাতে পারি।

'আমাকে আমার Thesis উপলক্ষে বাংলা ব্যতীত আসামী, উড়িয়া, মৈথিলী, পুরবীয়া, হিন্দী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি, মারাঠি, সিন্ধী, লাহিন্দা, কাশ্মীরী, নেপালী, সিংহলী, মালদ্বীপী ভাষার আলোচনা করিতে হইতেছে। প্রাচীন ভাষার মধ্যে প্রাকৃত ও আবেস্তারও চর্চা করিতেছি। ...তিব্বতীও শিখিতেছি।'

১৯২৮ সালেই শহীদুল্লাহ্ ঢাকায় ফিরে আসেন। অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ আলাদা হয়ে গেলে তিনি বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। ১৯৪৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স তখন সবে ২৩-২৪ হয়েছে। নবীনতা কাটেনি। বাংলা বিভাগের বয়সতো আরও কম। ফলে শহীদুল্লাহ্কে বাদ দিয়ে বিভাগের উৎকর্ষের কথা কল্পনা করা যেত না। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করেন। ১৯৪৪ থেকে১৯৪৮ পর্যন্ত শহীদুল্লাহ্ বগুড়া আজিজুল হক কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। ১৯৫৫ সালে সত্তর বছর বয়েসেও তিনি অব্যাহতি পাননি। ১৯৫৫ থেকে তিন বছর শহীদুল্লাহ্ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান আর পাশাপাশি আর্টস বিভাগের ডীন ছিলেন। পাকিস্তান সরকার উর্দু অভিধান রচনা করতে চাইলে শহীদুল্লাহ্ করাচিতে উর্দু উন্নয়ন সংস্থার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন ও উর্দু অভিধান প্রকল্পের সম্পাদক পদে কাজ করেন। এক বছর করাচিতে থেকে ১৯৬০ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বাংলা আকাডেমীতে যোগদান করেন। বাংলা আকাডেমীর কাজে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত একাডেমীর ইসলামি বিশ্বকোষ প্রকল্পের সম্পাদক ছিলেন। ওই চারবছর তিনি পাকিস্তান এশিয়াটিক সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন। ওই সময়ে তিনি বাংলা পঞ্জিকা তারিখ বিন্যাস কমিটিরও সভাপতি পদে কাজ করেন।

১৯৬৭ সালের ১লা এপ্রিল শহীদুল্লাহ্ এমিরিটাস অধ্যাপক পদ লাভ করেন। আমৃত্যু তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। ১৯৬৯ সালের ১৩ই জুলাই ঢাকা শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলা এভাগ ওভাগ হবার আগেই শহীদুল্লাহ্ ঢাকা চলে গিয়েছিলেন। ফলে দেশভাগের যন্ত্রণা তাঁকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করতে হয়নি। তবু জন্মভূমির প্রতি ভালোবাসা তাঁর চিরকাল থেকেই গিয়েছিল। ভাবতে অবাক লাগে, পাকিস্তানে নিজ বাড়ির নাম তিনি চব্বিশ পরগণার গ্রামের নামে 'পেয়ারা হাউস' রেখেছিলেন।

ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় শহীদুল্লাহের চেয়ে পাঁচবছরের ছোট ছিলেন। দুজনের পরিচয় ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। শহীদুল্লাহের একটি গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে সুনীতিকুমার বলেছিলেন, '...তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া একটি বিশেষ শিক্ষিত ও মার্জিত মনের পরিচয় পাইলাম, এবং তিনিও আমাকে অনুজের মতন দেখিতে লাগিলেন।' যতবার শহীদুল্লাহ্ ঢাকা থেকে নিজের বাড়িতে এসেছেন, ততবার কলকাতায় সুনীতিকুমারের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছেন। সুনীতিকুমারের সবসেরা কাজ 'ওরিজিন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ'। এই বইয়ে শহীদুল্লাহের চর্যাপদ নিয়ে কাজের প্রচুর প্রশংসা করেন তিনি। ভাষাতত্ত্বের কিছু কিছু বিষয়ে দুজনে একমত হতেন না। তবু ক্ষতি কি। সুনীতিকুমারের কথাতেই বলি, '...ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে নূতন অনেক জিনিস দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি আমি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি এবং কতকগুলি সম্বন্ধে আমি স্বতন্ত্রমত পোষণ করি। কিন্তু এই বিষয়ে এই মতান্তর গৌণ ব্যাপার। তিনি যাহাই লেখেন তাহা অধিকারী পণ্ডিতদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত পাঠের যোগ্য।'

শহীদুল্লাহের গবেষণার বিষয় যেহেতু ভাষা, রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ চব্বিশ বছরের ছোট এই প্রতিভার দিকেও আকৃষ্ট হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদুল্লাহ্ যখন গবেষণা-সহায়ক ছিলেন তখন তিনি নিয়মিত শান্তিনিকেতন যেতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৯২০ সালে শহীদুল্লাহ্ ছোটদের কাগজ 'আঙুর' সম্পাদনা করেন। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ 'রথযাত্রা' কবিতাটি দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর পরিচালন কমিটিতে রবীন্দ্রনাথ শহীদুল্লাহকে চেয়েছিলেন। পৌষ উৎসবে তিনি একাধিকবার শান্তিনিকেতনে অতিথি হয়ে এসেছেন। শহীদুল্লাহ্ রচিত 'ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের হাতে উচ্চ প্রশংসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'বাংলা ভাষাতত্ত্ববিচার সম্বন্ধে আপনার যোগ্যতার প্রশংসা অনাবশ্যক'। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রবন্ধ পড়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ একাধিকবার লেখা পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। মোটামুটি একটা হিসেব থেকে দেখা যায় শহীদুল্লাহ্ পরিষৎ-এর কাগজে প্রায় পঁচিশের কাছাকাছি নিবন্ধ লিখেছেন। নিবন্ধগুলি বাংলা ১৩২৫ সাল থেকে ১৩৬৭ সালের মধ্যে বেরিয়েছে। সম্পাদক শহীদুল্লাহ্কেও আমরা অবহেলা করতে পারি না। 'আল-এসলামের' পত্রিকার সহ-সম্পাদক পদে তিনি ১৩২৩ সালে কাজ শুরু করেন। এই পত্রিকা পাঁচ বছর বেরিয়েছিল। সম্পাদনা প্রসঙ্গে শহীদুল্লাহ্ ও মোজাম্মল হকের সম্পাদিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র কথা বলতেই হয়। ত্রৈমাসিক এই কাগজ ১৩২৫ সালে শুরু হয়েছিল। এই পত্রিকায় নজরুল ইসলামের অনেক লেখা বেরোয়। নজরুল তখন পরিচিত লেখক নন। শহীদুল্লাহ্ যোগ্যতাকে প্রশ্রয় দিতে জানেন। নজরুল ইসলামের প্রচুর লেখা প্রকাশ করেছিলেন। প্রমাণ নজরুলের চিঠিতেই পাওয়া যায়। নজরুল লিখছেন,

'আপনার নিকট কত বেশি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছি নে। আপনার এরূপ উৎসাহ বরাবর থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব, তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাত সত্য কথা'।

চিঠির তারিখ ১৯শে আগস্ট ১৯১৯। নজরুলের বয়স তখন একুশ বছর।

ঢাকায় শহীদুল্লাহ্ 'Peace' নামে একটি পত্রিকার আট বছর সম্পাদক ছিলেন। পত্রিকাটি সেসময় যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিল। শহীদুল্লাহের অবদানের কথা বলতে চাইলে 'পাঠ্যবই

রচয়িতা' শহীদুল্লাহের কথাও আমাদের বলতে হয়। সাধারণত বড়োমাপের গবেষণায় যাঁরা ডুবে থাকেন, ছোটদের বই লেখালেখিকে জরুরি কাজ মনে করেন না। কেউ কেউ নিশ্চয়ই এই তালিকার বাইরে ছিলেন। শহীদুল্লাহ্ তাঁদের একজন। বাংলা সাহিত্যের পাঠ্যবই তিনি রচনা করেন চৌদ্দটি। বইগুলো সব প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্য ছিল। তাঁর লেখা ব্যাকরণ ও রচনার বই পাঁচটি। ইতিহাস বই সাতটি। বিজ্ঞানী মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদাকে আমরা এমন প্রচুর পাঠ্যবই লিখতে দেখেছিলাম। কত যে বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন তিনি, কত সভায় সভাপতিত্ব করেছেন তার কোন হিসেব নিকেশ নেই। বড় হবার সকল বিড়ম্বনাই সইতে হয়েছে। শহীদুল্লাহের ইংরেজি নিবন্ধের সংখ্যাও কম নয়। বাংলা নিবন্ধগুলির মত তাঁর ইংরেজি লেখালেখি এখনও সব গ্রন্থিত হয়নি। ভবিষ্যতের কোন জহুরি এই কাজ করবেন আমাদের প্রত্যাশা রইল।

পাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল তার প্রেরণার প্রধানতম উৎস ছিলেন শহীদুল্লাহ্। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর ভালোবাসাকে পাকিস্তানের শাসকদল 'বিশ্বাসঘাতকতা' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছে। গোয়েন্দা পুলিশ তাঁকে কম হয়রানি করেনি। সংস্কৃতজ্ঞ হবার বিপদ ছিল অনেক। গোঁড়া মুসলমানেরা তাঁকে 'হিন্দুর চর' বিবেচনা করতেন। গোঁড়া হিন্দুরা তাঁকে 'অচ্ছুৎ' বিবেচনা করতেন। ছাত্রজীবনের ঘটনাতো আমরা আগেই বলেছি।

পাকিস্তান যেদিন সারাদেশে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল সেদিন তিনি লিখিত আকারে তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। বুদ্ধিজীবী মহলে তিনিই প্রথম প্রতিবাদী ছিলেন। সরকার যখন নানা 'ভাষা কমিটি' তৈরি করে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, তিনি ঘৃণাভরে সেসব আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদুল্লাহের সন্তান মুর্তজা বশীর আহত হয়ে ঘরে ফিরেছেন, সব ঘটনা শুনে শহীদুল্লাহ্ বলেছিলেন, 'নিজের মাতৃভাষার জন্য যদি তোমার প্রাণও যেত আমার কোনও দুঃখ থাকত না।' এই শহীদুল্লাহ্ যখন রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের অভিমত জানতে পেরেছেন তখনও বিদ্রোহে সোচ্চার হয়েছিলেন।

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে মরনোত্তর ডি. লিট. ডিগ্রি দান করেছে। বর্তমান বাংলাদেশে তাঁর নামে একটি কলেজও তৈরি হয়েছে।

তাঁর কাজ তাঁর মুক্ত ভাবনা স্মরণীয় করে রাখতে এপারেও আমাদের কিছু কিছু কাজ দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। নবীন প্রজন্ম এমন মূল্যবোধে শ্রদ্ধা জানাবেন—ভাবলে কি ভুল করব?

শ্রেষ্ঠ গল্পসম্ভার

সম্পাদনা
তপনকুমার দাস
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

অপরূপ রূপকথা ৭০.০০

সম্পাদনা
কমল চৌধুরী
যুগান্তর গল্পসম্ভার ১০০.০০
অমৃত গল্পসম্ভার ১০০.০০

সম্পাদনা
পূর্ণেন্দু ঘোষ
মাসিক বসুমতী গল্পসম্ভার ১০০.০০

সম্পাদনা
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

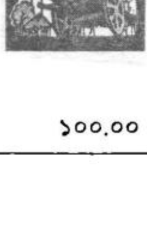

ভারতী গল্পসম্ভার
উত্তরা গল্পসম্ভার
বঙ্গবাণী গল্পসম্ভার

সম্পাদনা
শৈলেন চক্রবর্তী
প্রবাসী গল্পসম্ভার ১০০.০০

প্রেম-অপ্রেমের

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শেষের কবিতা
চতুরঙ্গ
চার অধ্যায়
ঘরে বাইরে
মালঞ্চ

আজকের ভাষায়

ছোটদের রামায়ণ ২৫.০০
ছোটদের চিড়িয়াখানা ৩০.০০
ছোটদের মহাভারত ৩৫.০০
রামের সুমতি ২৫.০০
বিন্দুর ছেলে

আনন্দমঠ
দেবী চৌধুরানি
রাধারানি
ইন্দিরা
বিষাদ-সিন্ধু
গল্প বলে ভারত

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫

ক্লাসিকস গল্প

দুঃসাহসী রঞ্জু ৫০.০০
ভাবা সমগ্র ১ ৭৫.০০
দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ৩০.০০
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মার্ডার ডট কম
আমি পিশাচ

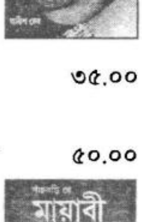

অনীশ দেব
অদ্বিতীয় কর্নেল
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
মহারাজা সিং দ্য গ্রেট ৩৫.০০
হিমানীশ গোস্বামী
জগুমামার চার রহস্য ৫০.০০
ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়
মায়াবী

পাঁচকড়ি দে
গঙ্গা থেকে নায়েগ্রা
দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী
নারীঘটিত ৪০.০০
শ্যামল দত্তচৌধুরী
অলৌকিকের আড়ালে ৩০.০০
ডাঃ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

নমস্কার, ডাক্তারবাবু

পাড়ার ডাক্তারবাবুকে হঠাৎ একটি অচেনা লোক এসে বলল,—ডাক্তারবাবু, নমস্কার। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার চিকিৎসার জন্য আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ডাক্তারবাবু বেশ অবাক হয়ে বললেন,—নমস্কার। কিন্তু আমি তো সব রোগিকেই দেখলে চিনতে পারি। আপনার তো আমি কোনও চিকিৎসা করিনি!

অচেনা লোকটি বলল,—না, ডাক্তারবাবু! আপনি আমার নয়, আমার মামার চিকিৎসা করেছিলেন।

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার মামার নাম কী?

অচেনা লোকটি উত্তর দিল—আজ্ঞে, স্বর্গীয় ধরণীধর মহাপাত্র।

ডাক্তারবাবু তো হতবাক,—স্বর্গীয়? তার মানে?

অচেনা লোকটি এবার একগাল হেসে উত্তর দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু। আপনার কাছে চিকিৎসা করেই তো উনি মারা গেলেন আর আমিও মামার সমস্ত টাকাকড়ি, বিষয়-সম্পত্তি পয়ে গেলাম।

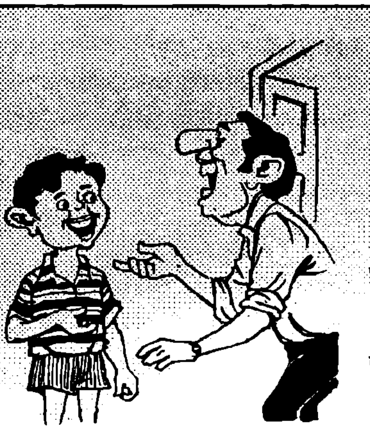

স্কুলের নাম

বাড়ির ছোট্ট ছেলেটিকে অতিথি জিজ্ঞাসা করলেন—খোকা, তোমার নামটা কী গো?

ছেলেটি উত্তর দিল—ডাকু।

অতিথি বললেন,—এ তো তোমার ডাক নাম। তোমার স্কুলের নাম কী?

ছেলেটি এবার গম্ভীরভাবে জানাল—হরিহরনারায়ণপুর সৌদামিনী দেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

প্রতিবেশী হার্টফেল করবে

'সুপার বাম্পার' এক লটারির টিকিট কিনে বোমবাবু তাঁর স্ত্রীকে বললেন,—আচ্ছা, যদি সত্যি-সত্যিই এই টিকিটে প্রথম পুরস্কারটা এসে যায়, তাহলে কী হবে?

ওঁর স্ত্রী একটু মুচকি হেসে জানালেন—তাহলে আমাদের প্রতিবেশী হার্টফেল করবে।

ফি-টা অ্যাডভান্স দিন

ডাক্তারবাবু (রোগিকে) ঃ আপনি স্মৃতি ও স্মরণশক্তি দুটোই হারিয়ে ফেলেছেন। আমার ফি ১০০ টাকা, আর ফি-টা অ্যাডভান্স দিন।

দুটো গাধা

অলি ঃ আচ্ছা কলি, অনেক জায়গাতেই বর ঘোড়ায় চেপে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু বর গাধায় না চেপে ঘোড়াতেই চেপে আসে কেন?

কলি ঃ এটাও বুঝলি না? কনে যাতে এক সঙ্গে দুটো গাধা দেখে ঘাবড়িয়ে না যায় সেই জন্য।

রোগা হওয়ার চেষ্টা কর

ভীষণ মোটা এক বাবা তাঁর ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা খোকা। তোর যখন আমার মতো বয়স হবে তখন তুই কী করবি?

ছেলে জানাল—রোগা হওয়ার চেষ্টা করব, বাবা।

গেঞ্জি খোলার সময় আটকে যায়

সবকটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য অধিকর্তা বিভিন্ন গ্রামের স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন।

এইরকম এক স্বাস্থ্য পরীক্ষক কোনও একটি স্কুলের এক বাচ্চা ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, নাক বা কান নিয়ে তোমার কোনও অসুবিধে হয়?

ছেলেটি উত্তর দিল—হ্যাঁ। গেঞ্জি খোলার সময় আটকে যায়।

ধ্রুবজ্যোতি চৌধুরী

শুধু মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতাতেই করে নেওয়া যায় অনেক দরকারি কোর্স ও ট্রেনিং। যা শিখে ভবিষ্যতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে খুব একটা সমস্যা হয় না। কিন্তু আমরা সকলেই সবটা জানি না। সময় সময় নানান জরুরি পাঠ্যক্রম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পেতেও সমস্যায় পড়তে হয়।

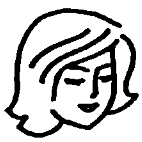

এমনকী আর্থিক সামাজিক পরিস্থিতি, মেধা ও আগ্রহের বিষয়কে ঠিক না বুঝেই অনেক সময় আমরা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি। যার ফলে যেমন জীবনের কয়েকটা মহামূল্যবান বছর তো নষ্ট হয়ই, তেমনি হয় অর্থের অপচয়। কিন্তু কীভাবে এগোবে তোমরা? যেসব নিয়েই ধারাবাহিক পরামর্শ দিচ্ছেন তরুণ কেরিয়ার কাউন্সিলার

শংকর দত্ত

কী পড়বে? কেন পড়বে?

এনভায়রনমেন্ট সায়েন্স

পরিবেশ দূষণ নিয়ে এখন সারা বিশ্বজুড়ে হইচই। আমাদের চারপাশের পরিবেশ আমাদের অজান্তেই ক্রমশ দূষিত হয়ে পড়ছে। জলদূষণ, বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ এমনকি দৃশ্যদূষণের কারণেও সমাজ তার স্থিরতা হারাচ্ছে। এই 'পরিবেশও' এখন পাঠক্রমের বিষয় হয়ে উঠেছে। শুধু তাইই নয়, এই পরিবেশ বিজ্ঞান পাশ করে রীতিমত ভালো চাকরির সুযোগও রয়েছে। তাই পরিবেশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করতে এখন বেশ আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে।

ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই কোর্সে ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন হল বিজ্ঞান নিয়ে অর্থাৎ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। তবে বিজ্ঞানের স্নাতকরা অগ্রাধিকার পাবে।

কোর্স পর্যালোচনা

এনভায়রমেন্ট সায়েন্স-এর বিভিন্ন কোর্স চালু আছে। যেমন সবচেয়ে কম সময়ের জন্য অর্থাৎ ৬ মাস সময়ের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স চালু আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল ফর ট্রেনিং ইন ভোকেশনাল ট্রেড, সি এক্সপ্লোরারস্ ইন্সটিটিউট-এ। আবার ২ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স যেমন আছে তেমনি আছে ৩ বছরের ডিগ্রি কোর্স। নতুন দিল্লিতে জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার ডিগ্রি, এম.ফিল ও ডক্টরেট করারও সুযোগ আছে এই এনভায়রমেন্ট সায়েন্স-এ।

ভর্তির সময়

সাধারণত প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে ভর্তির আবেদন চেয়ে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে।

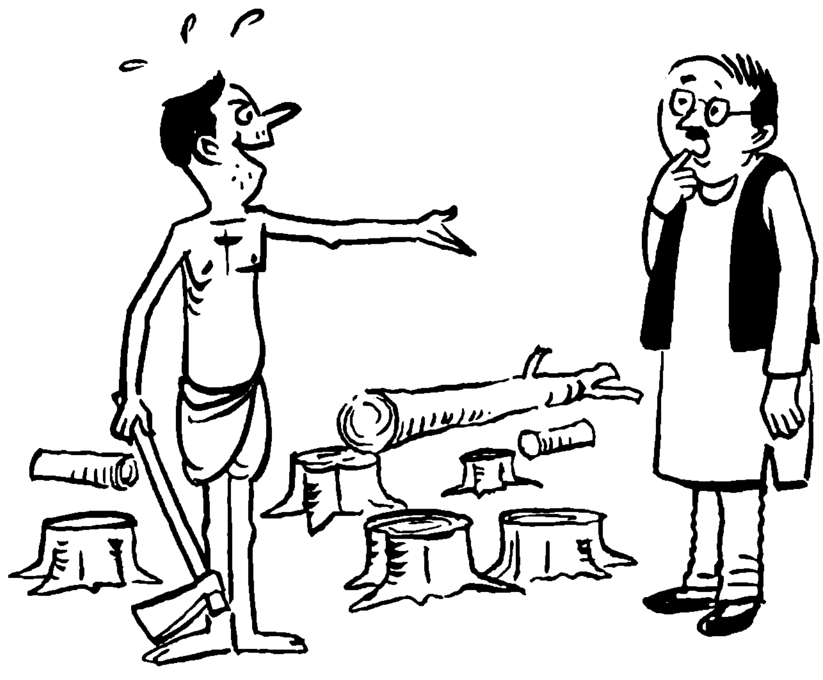

কাজের সুযোগ

এখন শহরে গ্রামেগঞ্জে ছোট-বড় নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আর এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে পরিবেশন সংক্রান্ত নানান নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। সেকারণেই গঠিত হয়েছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। সেখানে পরিবেশ বিশেষজ্ঞদের দারুণ কদর। এছাড়া এই কোর্স পাশ করে পরিবেশ সংক্রান্ত নানান খুঁটিনাটি কাজের প্রয়োজন, নিয়ম-কানুন ইত্যাদি জানতে বা জানাতে খোলা যেতে পারে কনসালটেন্সি কার্যও। নিজস্ব কনসালটেন্সি ফার্মগুলো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করতে পারে। সেটাও একজন পরিবেশবিদের সম্মানজনক পেশা হতে পারে। এক্ষেত্রে আয়ের সুযোগ যথেষ্টই ভালো।

কোথায় পড়বে

আগেই বলেছি এই কোর্স পড়বার এখন নানান প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন নতুন দিল্লির দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় বা জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় খুবই উপযুক্ত।

কলকাতাতে পড়তে হলে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ স্যোসাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০ ০৭৩। এছাড়া আরও যেসব প্রতিষ্ঠানে পড়বার ব্যবস্থা আছে সেগুলি হল যথাক্রমে—

এল. ডি. কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, আহমেদাবাদ, গুজরাট।

কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়ালটেয়ার, ভাইজাগ, অন্ধ্রপ্রদেশ।

মাউন্ট কারমেন্ট কলেজ, বাঙ্গালোর, কর্ণাটক।

আদিচুয়া চানাগিরি অব টেকনোলজি, চিকমাগালুর, কর্ণাটক।

জয়রাম রাজেন্দ্র কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং, কর্ণাটক।

জ্ঞানী জৈলসিং কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, ভাতিন্ডা, পাঞ্জাব।

কোলাপুর ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, কোলাপুর, মহারাষ্ট্র।

আউধ ইউনিভার্সিটি, ফৈজাবাদ, উত্তরপ্রদেশ, ২২৪-০০১।

ডারথেয়ার ইউনিভার্সিটি, কোয়েম্বাটুর, তামিলনাড়ু, ৬৪১০৪৬।

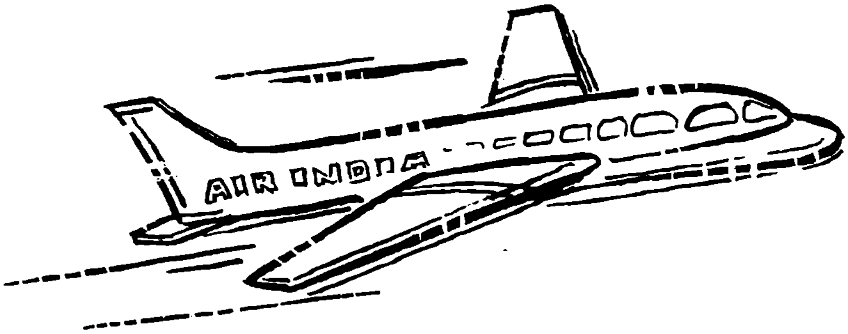

কমার্শিয়াল পাইলট

তোমার উচ্চতা যদি কমপক্ষে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি হয়, সুস্থ সবল শরীর এবং চটজলদি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে, সেইসঙ্গে রোমাঞ্চকর জীবন উপভোগ করতে চাও তাহলে কমার্শিয়াল পাইলট হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারো। এই চাকরিতে প্রতিনিয়ত যেমন জীবনের ঝুঁকি আছে তেমনি এই কাজে বেতনও প্রচুর। শুরুতেই কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা বেতন পেতে পারবে প্রতিমাসে। এরজন্য অবশ্য তিনটি লাইসেন্স তোমাদের আগে পেতে হবে। যেমন- ১) স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্স (২) প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স (৩) কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স।

ভর্তির যোগ্যতা

কোর্সের প্রাথমিক কোর্স অর্থাৎ সুডেন্ট্স পাইলট লাইসেন্স (এস.পি. এল) কোর্সে ভর্তির জন্য প্রার্থীকে ন্যুনতম বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ হতে হবে। বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৭ বছর। সেইসঙ্গে উচ্চতা হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি।

কোর্স

১) স্টুডেন্ট পাইলট লাইসেন্স ঃ এই লাইসেন্স পেতে গেলে কোন ফ্লাইং ক্লাবে প্রথমে নাম নথিভুক্ত করতে হবে ফ্লাইং-এর ট্রেনিং-এর জন্য। সেখানে প্রার্থীকে ১৬ বা ২১ মাসের একটি ট্রেনিং দেওয়া হয়। ট্রেনিং শেষ হলে একটি লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে প্রার্থীর মেডিকেল টেস্ট নেওয়া হয়। সেটাতে উত্তীর্ণ হলে তবেই এস. পি. এল. লাইসেন্স দেওয়া হয়।

২) প্রাইভেট পাইলট লাইসেন্স (পি. পি. এল) ঃ এস. পি. এল লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবে। এরজন্য ফ্লাইং-এর পরীক্ষা দিতে হবে তোমাদের। পাশাপাশি একটি লিখিত পরীক্ষারও সম্মুখীন হতে হবে। সেখানে সফল হলে এই কোর্সে প্রশিক্ষণ শুরু হবে। এই কোর্সটি ভালভাবে শেষ করতে খরচ হয় সাধারণত দেড় লক্ষ টাকার মতো।

৩) কর্মাশিয়াল পাইলট লাইসেন্স (সি. পি. এল) ঃ পূর্বোক্ত দুটি লাইসেন্স থাকলে এই কোর্সের জন্য আবেদন করতে পারবে। বি. এস. সি পাশ হলে ভালো হয়। মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে সুস্থতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এই লাইসেন্স পেতে গেলে প্রার্থীর ২৫০ ঘণ্টা উড়ানের যোগ্যতা চাই। এরপরেও প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে।

কোথায় ভর্তি হবে

ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় উড়ান অ্যাকাডেমি
ফুরসতগঞ্জ এয়ার ফিল্ড
রায়বেরিলি—২২৯৩০২, উত্তর প্রদেশ

ফ্লাইটেক অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমি
১০২ আলকানসার রোড
১০ নং ওয়েস্ট মরদপল্লী
সেকেন্দ্রাবাদ—৫০০০২৬, অন্ধ্রপ্রদেশ

রাজীব গান্ধী অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমি
১-১১-২৫৬/বি, প্লট নং ১০৮ অ্যাডজায়েন্ট
এয়ারপোর্ট রোড, বেগমপত
হায়দ্রাবাদ—৫০০০১৬

রাজপুতানা অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমি
৬ বি গঙ্গাপথ, সুরজনগর (পশ্চিম)

হরাইজন অ্যাভিয়েশন অ্যাকাডেমি
২ নয়ারত্ন লেন (শ্যামবাজার), কলকাতা
ফোন ৫৫৫-৬৬৩২, ৫৭৪-৮৪৯৩, ৫৪৩-৫১১৩

তোমাদের মনে নিশ্চয়ই কত প্রশ্ন জাগে! নানান সমস্যায় হঠাৎ-হঠাৎ দিশেহারা লাগে নিজেকে। কৈশোর যে বড় অস্থির সময়।

কাকে বলি মনের কথা? কার সঙ্গে আলোচনা করে শান্তি পাই? তোমরা তোমাদের সমস্যার কথা লিখে জানাও।

তোমাদের সমস্যা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করতে কলম ধরেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না মনোবিদ

ড. নীলাঞ্জনা সান্যাল

মনের কথা কই

আজকের যুগ বড় বেশি প্রতিযোগিতার যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই সবাইকে ঠেলে পিছনে ফেলে নিজে এগিয়ে যেতে চাইছি—জীবনের সুর "আমাকে জিততে হবে। আমাকেই মুকুটটা ছিনিয়ে নিতে হবে।"

প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আমি প্রথম হয়েছি। এখন পড়ি 'নাইন' এ। প্রতিবছর ক্লাসে প্রথম হলেও কেউ খুশি হয় না। সকলেই আমায় 'খাটো' করার চেষ্টা করে। যেমন—এবার বাংলায় পেয়েছি ৮৯, কিন্তু বাকি বিষয়গুলিতে ১০০য় ১০০। বাড়ি ফিরতেই শুরু হল মারধর। বলে—কোথায় গেল এগারটা নম্বর? মাঝে-মাঝে মনে হয়, ক্লাসে প্রথম হওয়াটা একটা অপরাধ। এক বন্ধু কিন্তু আমায় সবসময় সাহস জোগায়। ভয় হয় বাড়ির লোকেদের দুর্ব্যবহারের জন্যে। আমার কী করনীয়?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

আজকের যুগ বড় বেশি প্রতিযোগিতার যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা সবাই সবাইকে ঠেলে পিছনে ফেলে নিজে এগিয়ে যেতে চাইছি—জীবনের সুর "আমাকে জিততে হবে। আমাকেই মুকুটটা ছিনিয়ে নিতে হবে।" এ সুর মনের দিক থেকে অস্বাস্থ্যকর। অনেকে সে কথা বুঝছেন, অন্যদের বোঝানোর চেষ্টাও করছেন। কিন্তু না-বোঝার সংখ্যা অনেক বেশি। তোমার চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে তোমার বাড়ির বেশিরভাগ মানুষই এই দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে পড়েন। তুমি ক্লাসে বরাবর প্রথম হয়েও যদি এতো মারধোর খাও, তাহলে বুঝতে হবে তোমাকে ঘিরে ওদের আকাঙ্ক্ষা খুব বেশি। হয়তো ভাবেন দিনেকালে তুমি তেমন নাম করা কেউ হবে, বাড়ির সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে, দেশের দশের কেউ হবে। তাই একটু কোথাও কম নম্বর পেলে ওদের ভয় হয় যে তুমি বোধহয় সেই মানটা ধরে রাখতে পারবে না। ওদের মনের অস্থিরতায় ওরা তোমাকে সম্ভবত না-বুঝেই এতটা কষ্ট দিয়ে ফেলেন। তাহলে প্রশ্ন এতগুলো অবুঝ মানুষের অবুঝ প্রতিক্রিয়ার সাথে তুমি থাকবে কি করে? এসো তোমায় কিছু সহজ রাস্তা দেখাই।

বাড়ির মানুষের চাহিদার ধরণ ও তীব্রতা বোঝার চেষ্টা করো। জানতে চেষ্টা করো ওরা তোমার ভালোর সাথে নিজেদের কিছু প্রাপ্তি আশায় এত চাপ দিয়ে ফেলছেন। ওদের এই মানসিকতা তোমাকে শুধু বুঝতে বলব না, মেনে নিতে বলব। আপাতদৃষ্টিতে কাজটা তোমার কষ্টকর দুরূহ মনে হতে পারে। কিন্তু নিজের মনকে বলে যদি প্রস্তুত করার চেষ্টা করো, দেখবে ওদের আচরণে তুমি আর তেমন অস্থির হচ্ছ না, বিরক্ত হচ্ছ না। ওরা এ ধরণের ব্যবহার করলে সাময়িকভাবে তোমার মনটা একটু অন্ধকারে থাকবে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের জীবনের উদ্দেশ্যে ও মূল্যবোধের দিকে তাকে ফেরাতে পারলেই, দেখবে মন আবার আলোয় ভরে উঠছে। আসলে তোমাকে বুঝতে হবে ভালো ছাত্র হওয়া মানে কি? আমার কাছে এর উত্তর বুদ্ধির প্রয়োগে বিষয়কে শুধু বোঝা নয়, বিষয়কে বুঝে জীবনের খাতে তাকে প্রয়োগ করে এগিয়ে চলা। প্রথম হতে পারা সার্থকতার চিহ্ন, কিন্তু ক্লাসে প্রথম হওয়া মানেই, সুস্থ সদর্থক মানুষ হওয়া নয়। তেমন মানুষ হতে গেলে জীবনে গ্রহণের ক্ষমতাকে অনেক বাড়ানো দরকার। যা কিছুই হোক, নিজের উদ্দেশ্য থেকে সরে যাব না, লেখাপড়া থেকে উদ্ভুত বোধ নিয়ে, নিয়মের মধ্যে কিছুটা নিজেকে বেঁধে সদর্থক অভ্যাস তৈরি করতে পারলে, স্বাভাবিকভাবেই জীবনে সার্থকতা আসবে। তোমায় বলি মন দিয়ে পড়াশুনা করো, ঠিক-ভুল বিচারের ক্ষমতা তৈরি করো, নিজের ভুল তাড়াতাড়ি সংশোধন করার জন্যে নিজের মনে একটু নরম জায়গা রাখো, উদ্দেশ্য সামনে থাক—কাজে মন দিয়ে এগোতে চেষ্টা করো। দৌড়িও না কিছুর পেছনে, পড়ার সময় ফলের কথা ভেব না, পড়াটাতে মন দাও, ভালো ফল এমনিতেই হবে।

জীবনে ঔজ্জ্বল্য খোঁজার চেষ্টায় মেতে না থেকে জীবনকে চালনা করো, দেখবে কত রঙ জীবনের পাতায় আপনিই ভরে উঠছে।

আমি অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। পড়াশোনায় মোটামুটি। ক্লাসে অন্যদের তুলনায় একটু মোটা। তাই সকলে আমাকে 'হাতি' বলে রাগাবার চেষ্টা করে। আমার তখন খারাপ লাগে। নিজেকে ছোট বলে মনে হয়। একদিন-দুদিন ঠিক আছে। কিন্তু, রোজ এরকম বললে কার না রাগ হয় বলুন?

অনন্য সেন, কোন্নগর, হুগলি

তুমি এখন যে বয়সটাতে, তাতে শরীরের গঠনের দিকে সকলেরই চোখ বা মন একটু বেশি যায়। কারণ তোমরা বড় হচ্ছ তো, তাই বড়দের মতো কিছু-কিছু শারীরিক ও মানসিক চিহ্ন তোমাদের মধ্যে প্রত্যাশিত থাকে। লক্ষ্য করলে দেখবে ছোট বাচ্চা বেশ মোটাসোটা হলে আমাদের বেশ পছন্দ হয়। আমরা তাকে চটকে আদর করতে চাই। কিন্তু বয়ঃসন্ধিক্ষণে ছেলেমেয়েদের শরীরের ভাঁজ যখন বদলাতে থাকে, তখন তার মধ্যে বুদ্ধি ও সংযমের ছাপ খুঁজতে আমরা সুন্দর সুঠাম শারীরিক গঠনকে মূল্য বেশি দিই। রোগা বা মোটা নয়, সুঠাম শরীর ব্যক্তিত্বের অঙ্গ, আত্মবিশ্বাসের একটা সোপান। নিজের চেহারা শুধু নয়, অন্যদের সামনে নিজেকে উপস্থাপনা করার মধ্যে যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, তাহলে নিজের মনটাই বেশি খুশি থাকে। তোমাকে বন্ধুরা মজা করে খ্যাপাবে, কিন্তু অনেক অনেকবার আজেবাজে কথা নিজের সম্বন্ধে শুনতে কারোরই ভালো লাগতে পারে না। ওদেরও কিন্তু কথাটা বলতে বলতে প্রায় অভ্যাস হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তোমার যেটা করা দরকার তাহল, প্রথমেই ওদের এই ধরণের প্রতিক্রিয়ায় নিজের মনকে বন্ধ করে ফেলা, অর্থাৎ বলছে বলুক না, আমি কানে নিতে বাধ্য, কিন্তু মনে নিতে নয়। ওদের কথাগুলোকে শুধু আওয়াজ মনে করার চেষ্টা করো, তোমার যে খারাপ লাগে, এটা যদি সরিয়ে ফেলতে পারো, তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই ওরা আর তোমাকে এভাবে কষ্ট দিতে পারবে না। কারণ যে অস্ত্রটা নিয়ে কষ্ট দিয়েছে, সেটা তখন তোমার প্রতিক্রিয়া-বিহীন অবস্থায় ভোঁতা হয়ে যাবে, ওরা আর সেটা ব্যবহার করে আনন্দ পাবে না। তবে ওদের থেকে এবার তোমার নিজের দিকে মন ফেরাতে হবে। কি এমন আছে তোমার মধ্যে যা অন্যদের কাছে তোমাকে উপহাস্যযোগ্য করে তোলে? তাকিয়ে দেখো শুধু মেদের বাহুল্য শরীরে—এই কারণই নয়, তুমি বোধহয় কোনও কারণে তোমার বয়সোচিত ব্যবহার করতে পারছ না। একটু বাচ্চা-বাচ্চা থেকে যাচ্ছ। ব্যক্তিত্বের খোলসে একটু বড় হওয়া মন টেনে আনো, দেখো সমস্যা কমবে। শেষে আরেকটা কথা বলি। একটু মোটা শরীরটা রোগা করা বা সুঠাম করা কি খুব কঠিন? বোধহয় নয়। খেলাধুলা করো, ব্যায়াম করো নিয়মিত, খাবার ব্যাপারে সামান্য সংযম রাখো—দেখবে আয়নায় নিজেকে নিজেরই কিরকম সুন্দর লাগছে।

পাড়ায় আমার কয়েকজন বন্ধু রয়েছে। দলবেঁধে ওরা মাঝে-মাঝে আজেবাজে ফিল্ম দেখতে ছোটে। আমাকেও দলে টানতে চায়। আমি যাই না, ওদের সঙ্গে না যাওয়ায় ওরা আমাকে খেপায়। মাঝে-মাঝে ভয় ও দেখায়। আমাকে এ-ব্যাপারে পরামর্শ দিন?

পিন্টু দেবনাথ, আসানসোল

সত্যিকারের বন্ধুরা কাউকে খারাপ কিছুতে নিয়ে যায় না। তোমার বন্ধুরা হয় তেমন ভালো বন্ধু নয়। না-হলে অত্যন্ত অপরিণত-মনস্ক। দলবেঁধে কিছু করার বয়সটাতে তোমরা দাঁড়িয়ে। তাই যে-কোনও কাজে তোমাকে ওরা ডাকতেই পারে কিন্তু তুমি না গেলেই যদি ওরা তোমাকে কষ্ট দেয়, তাহলে ওদের কি আমরা সত্যিই বন্ধু মনে করতে পারি? তুমি একটু ভেবে দেখো। এবার বলি, হয়তো পাশাপাশি বড় হচ্ছ বলে ওরা তোমার বন্ধু হয়ে গেছে, কিন্তু পারস্পরিক ও ব্যক্তিত্বের যে তফাত তা থেকে বোঝা যাচ্ছে ওদের মূল্যবোধের সাথে তোমার মূল্যবোধের ফারাক অনেকখানি। তোমার যেটা খারাপ কাজ মনে হচ্ছে, ওরা সেটাই উপভোগ করতে চাইছে, ও যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয় ওরাও জানে কাজটা ভালো নয়, তাই দলভারি করে মনকে সান্ত্বনা দেওয়ার একটা জায়গা খোঁজে। একথাও ওরা ভাবতে পারে অল্পদিনের মধ্যে লোকে ওদের খারাপ ছেলে ভাববে, অথচ তুমি 'ভালো' হয়ে সামাজিক পরিচিতি পাবে। তাই নিজেদের দলে তোমাকে টানতে না পারলে ওরা অস্বস্তি বোধ করছে। আসলে এক্ষেত্রে সমস্যাটা ওদের, তোমার নয়। যদি মনে হয় ওদের সংশ্রব সম্পূর্ণ ত্যাগ করা সম্ভব, তাহলে তাই করো, নাহলে খোলাখুলি আলোচনায় আসতে পারো। বুঝিয়ে বলো, ওদের মতো আচরণ করতে তোমার কোথায় বাঁধছে, আর ওদের কার্যকলাপে সঙ্গ দিতে না পারলেও, তুমি ওদের বন্ধু হিসেবে খারাপ মনে করো না। ভয় পেয়ে, অসন্তুষ্ট হয়ে দূরে না দাঁড়িয়ে থেকে, ওদের কাছে এগিয়ে যাও—দেখবে সমস্যার গভীরতা কত ফিকে হয়ে গেছে।

তুমি এখন যে বয়সটাতে, তাতে শরীরের গঠনের দিকে সকলেরই চোখ বা মন একটু বেশি যায়। কারণ তোমরা বড় হচ্ছ তো, তাই বড়দের মতো কিছু-কিছু শারীরিক ও মানসিক চিহ্ন তোমাদের মধ্যে প্রত্যাশিত থাকে।

তোমাদের দপ্তর

গ্রামটি আমার

সেই যে ছিল গ্রামটি আমার
রূপসী নদীর পাড়ে।
হরেক মজার স্বপ্ন আঁকা
সবুজ বনে ঘিরে ॥
সবুজ পাতায়, লতায়-লতায়।
উড়ত বনের পাখি।
নীলাকাশে সোনার রোদ
করত আঁকা-আঁকি ॥
ধানের ক্ষেতে খেলত হাওয়া
সোনালী ধানে ঢেউ।
এমন সুন্দর গ্রামের রূপ
দেখে নি তো কেউ ॥
গ্রামের মাঝে সবাই মিলে
ছিল মিলে মিশে।
দুঃখ ছিল না, ব্যথা ছিল না
অগ্রাহায়ণ কি পৌষে ॥

জ্যোতির্ময় দাস
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)

সুচেতনা বিশ্বাস, তৃতীয় শ্রেণী, ৫ বছর, ডেভিড হেয়ার প্রাইমারি স্কুল, দুর্গাপুর।

গিরিডি ভ্রমণ

সামনে বড়দিন। কোথায় যাওয়া যায়? ঠিক হল, আসানসোলে বড়পিসির বাড়ি যাব। বেরুব বিকালে। সন্ধেবেলায় পৌঁছুব। রাত্রিটা থেকে সকালে টাটাসুমো চেপে যাব গিরিডি আশ্রম। শুনেছিলাম ওখানে সন্ন্যাসিনী মায়েরা থাকে। আগেভাগেই কথা বলেছিলাম টুকিদির সঙ্গে। কথা ছিল আমরা বেরুব তারপর টুকিদিদের সঙ্গে একজোট হয়ে আমরা সাতমূর্তিতে ট্রেনে গিয়ে উঠব। সাতমূর্তি বলছি কারণ আমরা সাত জন। মা, বাবা, আমি, টুকিদি, বুবলাদা, ছোট পিসিমণি পিসেমশায়। কিন্তু যা হল তা শুনলে তোমরা এত হাসবে যে পেটে খিল ধরে যাবে। হল কি আমরাতো ওভার ব্রিজে উঠেছি। এদিকে পিসিরা আছেন নিচে। আমরাও তাদের দেখছি না। তারাও আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না। তারপর ট্রেনে উঠে যেতে হল। সংশয়ে দম বন্ধকরে ট্রেনে চুপচাপ বসেছিলাম। বুঝতে পারছিলাম না, ওঁরা ঠিকমত উঠতে পারল কিনা। তারপর যখন নামলাম তখন তাঁদের দেখতে পেলাম। সে একটা কাণ্ড হয়েছিল বটে। তারপর পিসির বাড়ি এসে গেলাম। সেদিনটা যাহোক করে কাটল। পরদিন টাটাসুমো চেপে গিরিডির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। কত যে পাহাড় দেখতে দেখতে গেলাম ওখানে তার শেষ নেই। পথের মাঝে পড়েছিল বরাকর নদী। সেসব মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে একসময় পৌঁছুলাম গিরিডি সারদেশ্বরী আশ্রম। গিয়ে প্রথমেই মধুসূদনজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। সঙ্গে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাজী ও দুর্গা মায়ের প্রতিকৃতিতে। দুর্গামাই স্বপ্নাদেশ পেয়ে গিরিডিতে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গিরিডিতে অবস্থিত বলে এই আশ্রমের নাম হয়ে গেল গিরিডি আশ্রম। তারপর সুচিত্রা মাকে প্রণাম করলাম। উনি আমাদের আর্শীবাদ করলেন। আর একজন মায়ের কথা না বললেই নয়। তিনি হলেন ভবানী মা। উনি আমাদের সঙ্গে কত কী গল্প করলেন। বললেন দুর্গা মা, কমলা মা আরও অনেক মায়ের কথা। আমরা তো প্রথমে খেলতে ভয় পাচ্ছিলাম। উনিই আমাদের খেলতে বললেন। আমি ও টুকিদি মহানন্দে দৌড়ঝাঁপ করে খেললাম। তারপর খেতে বসলাম। খেয়ে মনে হল ভাত নয় যেন অমৃত খেলাম। সবশেষে মধুসূদনজীকে প্রণাম করে বেরুলাম আশ্রম থেকে। পথে উশ্রী নদীর ঝর্ণা দেখে রওনা হলাম বাড়ির উদ্দেশ্যে। এই মনোরম দৃশ্য আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

অর্ক মিত্র
শ্রেণী ঃ দ্বিতীয়, জেলা ঃ বর্ধমান

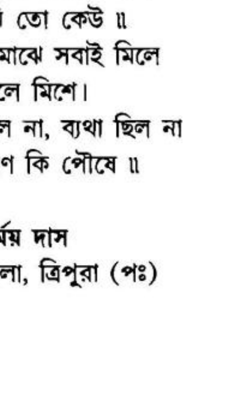

গণিত সংগ্রহশালা এখন সল্টলেকে

কলকাতার অদূরে সল্টলেকে গড়ে উঠছে গণিত সংগ্রহশালা। এটি পৃথিবীতে দ্বিতীয় গণিতের সংগ্রহশালা। জুরিখেই একমাত্র রয়েছে এ ধরনের ব্যবস্থা। সল্টলেকের নির্মীয়মান এই সংগ্রহশালায় থাকবে একসঙ্গে দেশি-বিদেশি নানা ধরনের গণিত ইতিহাস। থাকছে নানা প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক মডেল। পিথাগোরাসের সুপ্রাচীন লিপির পাশাপাশি এখানে রাখা হবে বরাহমিহির, আর্যভট্টের বহুমূল্যবান সব গাণিতিক সমীকরণ ও পুঁথি। ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি এর উদ্যোক্তা। বিজ্ঞানের সার্বিক প্রচারের পাশাপাশি বিজ্ঞানের প্রাণভোমরা গণিত নিয়ে এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করা হবে। বলাবাহুল্য এই উদ্যোগ যথেষ্ট সাধুবাদ যোগ্য।

নরম পানীয়ে বিপদ

সফট ড্রিঙ্কস বা নরম পানীয় খেতে সুস্বাদু ও দেখতে আকর্ষণীয় হলেও এর থেকে ঘটেছে নানা রকমের উপসর্গ। এই বালাইয়ের জেরেই আমেরিকার বিখ্যাত কিছু শহরে নরম পানীয় বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হচ্ছে। মার্কিন স্বাস্থ্য দফতরের মতে, এই পানীয় সবচেয়ে ক্ষতি করছে কমবয়সিদের। এদের মধ্যে বহুমূত্র, অম্ল ও সর্বোপরি মেদবাহুল্য রোগ বেশি করে ঘটছে। ফলে আশু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আগ্রহী সে দেশের প্রশাসন। ইতিমধ্যে লস এঞ্জেলেসের ৬৭৭টির মতো ছোট ও বড় স্কুলের আশেপাশে নরম পানীয় বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে। লস এঞ্জেলেস ছাড়াও টেক্সাস ও ক্যালিফোর্নিয়াতেও একই নিষেধাজ্ঞা জারি হতে চলছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কুলের চারদিকে একটু নিয়মকে জোরালো করলেই কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে এই পানীয় খাওয়ার প্রবণতাটা অনেকাংশে কমে যাবে।

কান ফোটাও বুঝে

জন্মসূত্রে যারা হৃদযন্ত্রের ত্রুটির শিকার, তাদের কান না ফোটানোই ভালো। কেননা এই সামান্য ব্যাপার থেকে মারাত্মক হৃদযন্ত্রীয় রোগ হতে পারে। এ রোগের নাম এন্ডোকারডিটিস। সম্প্রতি রোচেস্টার মাইয়ো রোগ চিকিৎসাকেন্দ্রের গবেষক ডাঃ ক্যারল ওয়ারনস্ এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি ৪৫০ জন ব্যক্তিকে নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে এই ঘটনার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। ডাঃ ক্যারলের মতে হৃদযন্ত্রের ত্রুটি বিশেষত হয় হৃদকপাটিকায়। আর কান বা শরীরের অন্য অংশ ছেদ ঘটানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দেহে ঢুকে এন্ডোকারডিটিস ঘটায়। তাহলে উপায়? সৌন্দর্য কিংবা একান্ত প্রয়োজনে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ফুটো করা কি যাবেই না? উত্তরে ক্যারল বলেছেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক আগে থেকে নিতে হবে।

জেনেটিক ধান

বেশি বৃষ্টিতে খাপ খাইয়ে বেড়ে ওঠা ধানের প্রজাতি ভারতে রয়েছে। কিন্তু অনাবৃষ্টি উপযোগী ধানগাছ! আমাদের জানা ছিল না। এই অজানাকে জানতে বেশ উচ্চমূল্যই দিতে হয়েছে এবছরই। ফলে বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য ছিল প্রবল খরাকে প্রতিহত করার এক ধানের প্রজাতি। দীর্ঘমেয়াদী এই গবেষণায় সম্প্রতি সফল হয়েছেন তামিলনাড়ু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ এ মণিকাম। তিনি ও তাঁর সহযোগীরা ধানের এক সহনশীল প্রজাতির উদ্ভব করেছেন। এই বিশেষ প্রজাতির ধান সামান্য জলেই উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে। ডঃ মণিকামের এই খোঁজ দারুণ আশা জাগিয়েছে জাতীয় স্তরে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ-এর আনুকূল্যে আগামী তিন বছরের মধ্যে এই প্রজাতিকে বাজারে আনা হবে। সম্পূর্ণ প্রকল্পে খরচ পড়বে প্রায় নয় লক্ষ টাকা।

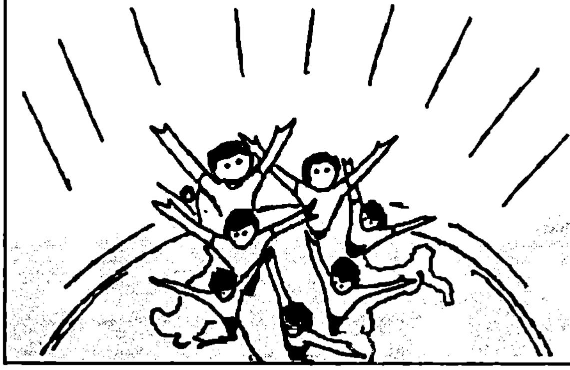

পৌষ মাসেই সর্বনাশ

ভারতের জনসংখ্যা একশো কোটির উপরে। এই জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে বৈ কমছে না। অন্যদিকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অস্বাভাবিক হারে কমে যাচ্ছে লোকসংখ্যা। বিশেষ করে ইতালিতে এই হ্রাসের হার দাঁড়িয়েছে ১.১০ শতাংশ। জনসংখ্যা এইভাবে কমতে থাকলে দেশের মধ্যেই ইতালি দারুণ মানব সম্পদ সংকটে পড়ে যাবে। এরই মাঝে বিশেষজ্ঞরা আবার একটা দারুণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছে সে দেশের সরকারকে। কারণ জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের মতে লোকসংখ্যার অধঃগমন মহামারীর বার্তাবহ। ফলে বেশ নড়েচড়ে বসেছে ইতালিসহ গোটা ইউরোপীয় ইউনিয়ন।

অপরাজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

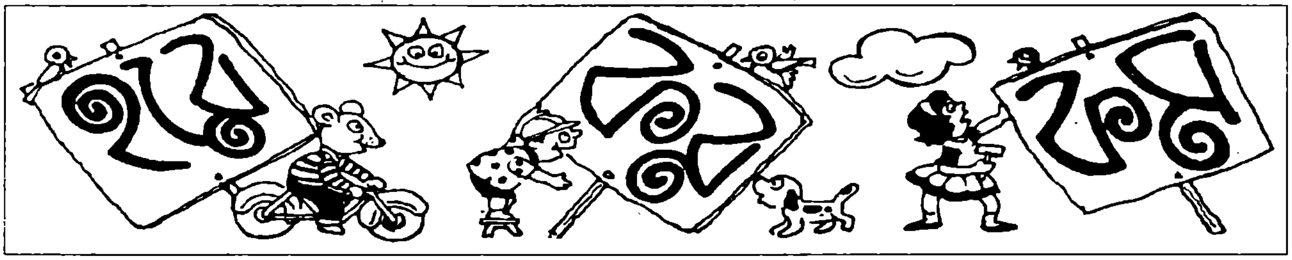

এটাই ঘটনা

কদিন না ঘুমিয়ে থাকতে পারবে? একদিন-দু'দিন? দু-দিনেরও বেশি? ওরে ব্বাবা, তবে ম্যাসিডোনিয়ার শেষ সম্রাট কিং পারসিয়াসকে কেউ বাঁচিয়েছিল কিনা জানা যায় না। রোমানদের প্রচলিত আইন মোতাবেক দণ্ড তাঁকে পেতেই হয়েছে। পুরো একটা বছর না ঘুমিয়ে থাকা! ২১২-১৬৬ বি. সি সময়কার ঘটনা এটা।

ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের নাম নর্ম গ্যারি। তিনি যখন ক্ল্যারিওনেট বাজান, মৌমাছিরা উড়ে এসে মেলা বসায় তাঁর গায়ে-হাতে-মাথায়-সর্বাঙ্গে। বাঁশি থামালে মৌমাছিরা ফিরে যায়। অধ্যাপককে প্রশ্ন করা হয়েছিল—ভয় করে না? উনি বললেন—দু-একটা অবশ্য হুল ফোটায়, কিন্তু তাতে কিছু হয় না!

আজ যেটা সিনেমা, প্রথম দিকে সেটা ছিল 'ভিটাস্কোপ'। আমেরিকার 'ভিটাস্কোপ হল' পৃথিবীর প্রথম সিনেমা হল। তৈরি হয় ১৮৯৬ এর ২৬ জুন। দশ সেন্ট দিয়ে টিকিট কেটে এখানে সিনেমা দেখা যেত। আর, আরও দশ সেন্ট বেশি দিলে সিনেমা অপারেটরের ঘরে গিয়ে পর্দায় ছবি ফেলার 'প্রোজেকশান' যন্ত্রটিও দেখতে পাওয়া যেত।

দূরালাপ

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়
৬৫৭ ২৬৯২

সুচিত্রা ভট্টাচার্য
৪১৫ ৬৪৪০

বকবকানি

কি'শোর বন্ধুরা,
কী খবর বলো? কেমন আছ সব?
পুজো নিশ্চয়ই ভালো কাটল সকলের।
আশা করি, পুজোয় তাদেরও মনে রেখেছ, যারা ফুটপাতে, ফাঁকা মাঠে দিন কাটায় অনাদরে অসুখে। ১৬ নভেম্বর দুপুর তিনটেয় 'হরে কর কম বৈঠক ২০০২'। দপ্তরে চলে এসো সকাল-সকাল সক্কলে। জানো তো এদিন তোমাদের জন্যে আনন্দ-আহ্লাদের অঢেল আয়োজন।
ভালো থেকো। ভালবাসা নিও—

তোমাদের পরিচালক বন্ধু।

ঠিকঠিকানা

কুমার শানু
৩৭, কবিতা, ১১ রোড জে. ভি. পি. ডি, স্কিম, জুহু, মুম্বাই ৪৯

মতি নন্দী
বিধান শিশু সরণী, ফ্ল্যাট ৪০৫
কলকাতা ৭০০০৪৫

চাপান উতোর

পাঠকদের দরবারে হাজির
শক্তিপদ রাজগুরু

প্রশ্ন ঃ এত জিনিস থাকতে কেন লেখার কথাই মনে হল?

উত্তর ঃ আমি বাঁকুড়া জেলার রাঢ় অঞ্চলের মানুষ। পথে পথে অনেক ঘুরেছি, দেখেছি। তারাশঙ্করের বসন, আখরা আমাকে ভীষণভাবে টেনেছে। এড়াতে পারিনি বিভূতিভূষণের প্রকৃতিকেও। এই ঘুরতে-ঘুরতে দেখতে-দেখতে মনে হল সাহিত্যে তো মানুষের কথা বলা যায়। নিঃসঙ্গতা অতিক্রম করতে পারা যায়।

প্রশ্ন ঃ পুজো সংখ্যার ফরমায়েশি গল্প উপন্যাস কি সত্যিই বড় সাহিত্যের কাজে আসে?

উত্তর ঃ না। এখনকার পুজো উপন্যাসগুলি বড় লেখার খসরা মাত্র। এগুলিকে একটা সূচনা হিসেবে ধরা যায়। আর এই চার/পাঁচ ফর্মা খুব একটা কাজের কথাও নয়, তবুও লেখকরা তো হাটে আলু-মূলো বেচতে যাবেন না। লিখেই তাদের পেট চলে।

প্রশ্ন ঃ সিনেমা উপযোগী গল্প-উপন্যাস কি আর লেখা হচ্ছে না?

উত্তর ঃ গল্প নিয়ে আগে বিস্তর ছবি হয়েছে। এবং ভালো ছবি হয়েছে। এখনও হতে পারে। হয় না, কারণ, এখনকার প্রযোজকরা বেশিরভাগই অবাঙালি। সংস্কৃতিমনস্ক নয়। বাংলা সংস্কৃতির প্রতি তাদের টান নেই, 'মুনাফা'ই তাদের কাছে বড়।

প্রশ্ন ঃ আপনার প্রিয় খাবার, প্রিয় রং কী? প্রিয় অভিনেতা কে?

উত্তর ঃ যখন যা পাই তা-ই খাই। পথে-পথে ঘুরে যা পেয়েছি খেয়েছিও। তবে ডাল-ভাত-শাক-সবজিই আমার প্রিয়। প্রিয় রঙ সবুজ আর প্রিয় অভিনেতা? উত্তমকুমার।

প্রশ্ন ঃ ছোটদের জন্যে কী পরামর্শ?

উত্তর ঃ ছোটরা মন দিয়ে পড়াশোনা করুক। টিভির উৎকট দৃশ্য যেন না দেখে। সমাজের মঙ্গলে কাজ করার জন্যে এখন থেকেই তৈরি হতে হবে।

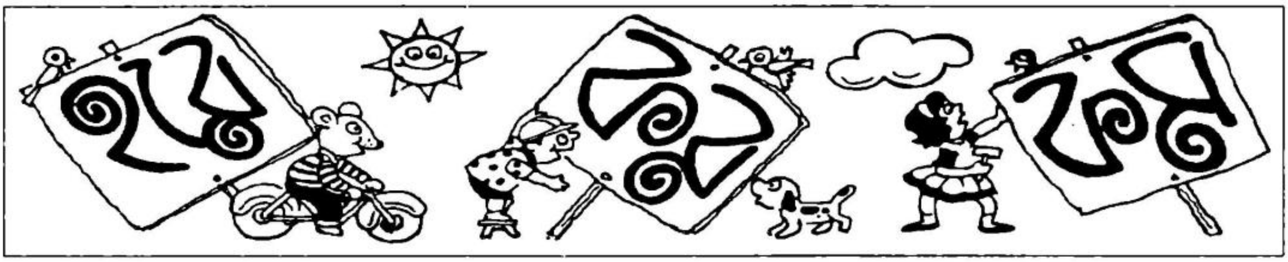

১) ভারতের কোথায় দোতলা ট্রেন চলে? সোমনাথ বোস, নদীয়া।

২) প্রথম ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপক ভারতীয় কে? বিনয় বাগচী, মদনপুর।

৩) 'সবার উপরে' ছবিটি কবে মুক্তি পায়? রাজু কুণ্ডু, কাটোয়া।

৪) লোহা কার সংস্পর্শে সাদা হয়? তুহিনকুমার দে, আন্দুল রোড

৫) পৃথিবীতে সর্বাধিক ব্যবহৃত গান কোন্‌টি? প্রসেনজিৎ সামন্ত, বরাহনগর।

৬) 'দ্য স্ট্রাগল ইন মাই লাইফ' গ্রন্থটি কার লেখা? নয়ন বসু, হরিপাল।

৭) 'ECG' পুরো কথাটা কী? অনুসূয়া সেন, গোঘাট।

ঠিক জবাবে ইনাম পাবে

৮) 'দ্য ডেইলি মিরর' কোন্ দেশের খবরের কাগজ? সৌম্য রায়, বরাহনগর।

৯) ভারতের কোন্ দুটি শহরের মধ্যে প্রথম 'এস. টি. ডি' পরিষেবা চালু হয়? বিপ্লব ভট্টাচার্য, শ্রীরামপুর।

১০) বেতারে 'মহিষাসুরমর্দিনী' অনুষ্ঠানটি কত সালে ও কোন্ দিন প্রথম প্রচার করা হয়? অয়ন্তিকা মুখার্জী, যাদবপুর।

আগস্ট সংখ্যার উত্তর

১) ১৭৭৫-র ৫ আগস্ট ২) ১৯৪১-এর ১৭ জানুয়ারি ৩) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) ৪) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ৫) রবীন্দ্রনাথ ৬) ২৪টি ৭) লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ৮) কারা অধিকর্তা সিম্পসনকে ৯) সুভাষচন্দ্র ১০) চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী।

পুরস্কার পাচ্ছে

পিন্টু দেবনাথ, *আসানসোল*

কয়েকটি উত্তর যারা ঠিক দিয়েছে : রামী ধাড়া, সায়ন্তী কর, অর্ণব বসু, মহুয়া সেন, অর্ক মিত্র

কার ছবি / কিসের ছবি

এই ছবিটি কার?

এই ছবিটি কিসের?

আগস্ট সংখ্যার উত্তর

প্রথম ছবি

বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ছবি

মুদ্রা (হুসেন শাহের আমলের)

জুলাই সংখ্যার উত্তর

প্রথম ছবি	দ্বিতীয় ছবি
উত্তমকুমার	**মাটির উনুন**

বন্ধু চাই

প্রদীপ্ত দাস
প্রযত্নে : চিত্তরঞ্জন দাস
মধুবাটী, বলরামবাটী, হুগলি ৭১২৪০৯
শখ : বইপড়া, বন্ধুত্ব করা ও গান শোনা

অভিষেক দেবনাথ
প্রযত্নে : দুলাল দেবনাথ
জওহরলাল নেহেরু রোড, ব্যাদড়াপাড়া
নবদ্বীপ, নদীয়া-৭৪১৩০২
শখ : ক্যুইজ চর্চা করা, পুরনো দিনের গান শোনা ও বই পড়া

প্রদীপ্ত জানা
প্রযত্নে : বসন্তকুমার জানা
সল্টলেক, ব্লক-ডি ই, ইন্সপেকশন বাংলো,
কলকাতা ৭০০০৬৪
শখ : বন্ধুত্ব করা, গল্পের বই পড়া ও গান শোনা

হেঁয়ালি

১। ভেবেচিন্তে বলো তো—
মানুষ নেই কোন্ গ্রামে?

২। ঝাল ছাড়লে লক্ষ্মী,
দেশ খুঁজলে পাচ্ছি।

৩। ভরা হলে সমৃদ্ধি
ছোঁড়া হলে ভয়বৃদ্ধি।

প্রসেনজিৎ সামন্ত
আলমবাজার

আগস্ট সংখ্যার উত্তর

১। চাদর, ২। নকুল

আগে আসার ভিত্তিতে পুরস্কার পাচ্ছে

প্রতীক দাশগুপ্ত, *বার্ণপুর*

উত্তরদাতাদের নাম

সৌম্যকান্তি ত্রিপাঠী, মৌমিতা দে, সত্যজিৎ সরকার

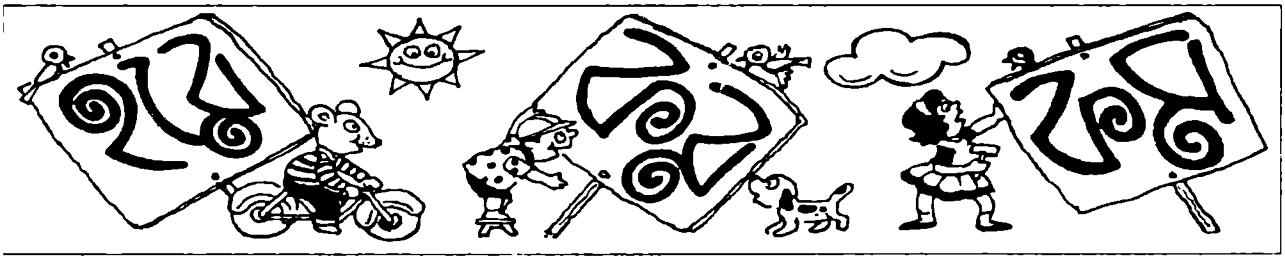

গল্প গড়ো

আগস্ট প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত গল্প

শনিবার। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। টিপটিপ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে বেশ। শেষ লোকাল ট্রেনটা এতক্ষণে কুলতিপুর পেরিয়ে গিয়েছে। সুবিধের জন্যে মেঠোপথই বেছে নিয়েছেন অতুলবাবু। সঙ্গে ছাতা নেননি। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিঃঝুম। এমন সময় দ্বারিকবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনিও হাঁটা পথে বাড়ি ফিরছেন। অতুলবাবু দ্বারিকবাবুকে বললেন —ভালোই হল, একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। তারপর তারা গ্রামের নানা বিষয়ে আলোচনা করতে-করতে এগোতে থাকলেন। একসময় অতুলবাবু বাড়ি এসে পৌঁছলেন।

দ্বারিকবাবুর বাড়ি আরও কিছুটা দূরে। তাকে এগোতেই হল। স্ত্রী এসে দরজা খুললে অতুলবাবু বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

স্ত্রী বললেন—সবাই ভালো আছে, তবে পিঙ্কি খুব কান্নাকাটি করছিল তোমার জন্যে।

—আর পাড়াপড়শীর খবর?

—জানো তো, গতকাল রাতে দ্বারিকবাবু হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন!

জ্যোতির্ময় সাহা, ষষ্ঠশ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট স্কুল।

বাংলার গৌরব গাঙ্গুলি সৌরভ—কথাটা এখন আর শুধু কথার কথা নয়। বোম্বাইছাপ বিশেষজ্ঞদের অনেক হিসেবই ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন অধিনায়ক সৌরভ। আবার ব্যাটসম্যান সৌরভ—সেও তো কম নয়! কিন্তু অধিনায়ক সৌরভ, না, ব্যাটসম্যান সৌরভ—কোন্ সৌরভ কে তুমি দলে বেশি দরকার মনে কর? ১৫০ শব্দের মধ্যে গুছিয়ে লিখে পাঠাও। মজাদার পুরস্কার!

বাতেলা

দুই বন্ধু পাশাপাশি বসে গল্প করছে।

—এই জানিস, আমার বাবা না , সারা দিনে অন্তত এক থেকে দেড়শ বার দাড়ি কাটে!

—কী? তোর বাবা দিনে দেড়শ বার দাড়ি কাটে? তোর বাবা নিশ্চয় পাগল।

—আরে, না, রে না, আমার বাবা মোটেই পাগল নয়।

—তুইই চিন্তা করে দেখ না, কোনও লোক যদি দিনে এক থেকে দেড়শ বার খালি দাড়ি কাটে, তাহলে সে পাগল নয়তো কী?

—আমার বাবা পাগল নয়। আসলে না, আমার বাবার না, একটা সেলুন আছে।

লিখে পাঠিয়েছে **তুহিনকুমার দে** *আন্দুল রোড, হাওড়া*

শব্দ হেঁয়ালি

১	২		■	৩	৪
৫		■	৬		
■	৭	৮			
৯	■	১০		১১	■
১২	১৩		■	১৪	১৫
১৬		■	১৭		

প্রবীর বিবাড়

পাশাপাশি : ১) বিদ্যুৎ ৩) কচি নারকেল ৫) কেনাকাটা ৬) ভাঁড়ার ঘর ৭) লোভ ১০) হত্যা, বধ ১২) কলঙ্ক ১৪) তপস্বী, ঋষি ১৬) উদ্ধার, সংরক্ষণ ১৭) তরিতরকারি।

উপর নিচ : ১) চাকা, পৌরাণিক অস্ত্র বিশেষ ২) এক নম্বর ৩) লাঠি ৪) পানের খেত ৬) নিরঞ্জন ৮) অল্প সময় ৯) ফেরিওয়ালা ১১) নিদর্শন ১৩) ছোট উকুন ১৫) স্বয়ং।

আগস্ট সংখ্যার উত্তর

পাশাপাশি : ১) সুর ৩) দৈবজ্ঞ ৫) পাথর ৭) দশহরা ১০) শতানক ১২) লতিকা ১৪) জোকার ১৫) সিনা।

উপর নিচ : ১) সুপারিশ ২) রথ ৪) বরাহ ৬) রদন ৮) শকল ৯) রাতকানা ১১) তালিকা ১৩) তিসি।

আগে আসার ভিত্তিতে পুরস্কার পাচ্ছে

সৌম্যকান্তি ত্রিপাঠী, মুগবেড়িয়া পূর্ব মেদিনীপুর

উত্তরদাতাদের নাম : **তৃষ্ণীক ঘোষ ও অর্কপ্রতাপ ঘোষ**

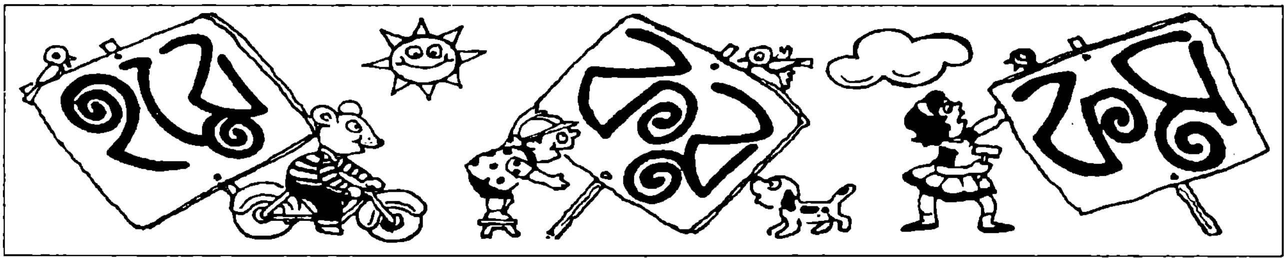

আগস্ট মাসের সেরা ছড়া

মামদো বসে বাজায় বাঁশি,
নাচ জুড়েছে পেত্নিমাসি
এই আসরে ঢুকতে মানা,
ওরা যে সব ভূতের ছানা।

ঐশিক ঘোষ, *গড়িয়া, কলকাতা ৮৪*

ভালো লেগেছে ঃ কৌস্তভ রায়চৌধুরী, অনির্বান চৌধুরী, সৌভিক কর, কুনালজিৎ রায়, প্রদীপকুমার মিত্র, স্বরূপ কুণ্ডু ও সৌরদীপ ব্যানার্জি

ছড়া গড়া

চার লাইনের প্রথম দুটো লাইন দেওয়া হল। সঙ্গে ছবি। ছড়াটা বানিয়ে জলদি পাঠাও আমাদের ঠিকানায়—

ফুটপাতে মা রান্না করে,
পাশেই ছেলে নামতা পড়ে

কী হতে চাই

বড় হয়ে মানুষের সেবা করার জন্যে বড় ও আদর্শ ডাক্তার হতে চাই।
রনি চৌধুরী, নবিপুর, মুর্শিদাবাদ

সমাজসেবী হতে ইচ্ছুক।
সোমনাথ বোস, নদীয়া

আমি 'মানবিক' হতে চাই।
টুইঙ্কল রায়, ভবানীপুর

হরে কর কম বৈঠক ২০০২

এবার 'হরে কর কম বৈঠক ২০০২' এ উপস্থিত থাকছেন ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার ভট্টাচার্য, শ্যামল চক্রবর্তী, তপনকুমার দাস প্রমুখ। কোন্ লেখককে কী প্রশ্ন করবে—তোমরাই ঠিক করে নিও। হরে কর কম বিভাগীয় পুরস্কারগুলিও এই সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হবে। নিজে এসো বা কাউকে পাঠাও। কেমন।

সইসাবুদ

আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল

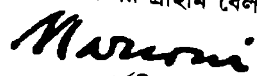

মার্কনি

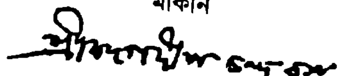

জগদীশ চন্দ্র বসু

গা
ল
গ
প্পো

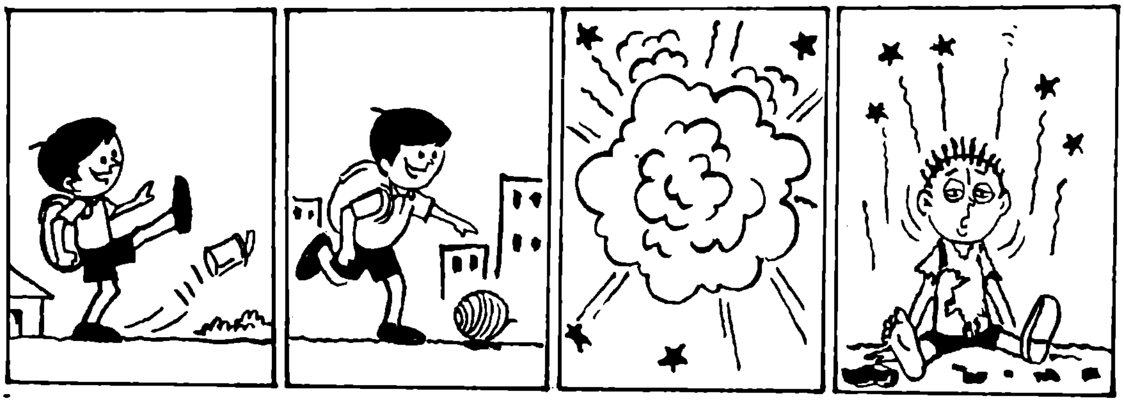

পরিচালক শুভাশিস ঘোষ ছবি জুরান নাথ

শা ন্তি প্রি য় ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

খেলাধূলা করে যে...

লেখাপড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে।

কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে আজকাল বলতে হবে, খেলাধূলা করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে।

গুটি কয়েক উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হরভজন সিং ভারতের পক্ষে খেলার জন্যে প্রথম যে টাকা পেয়েছিল তাই দিয়ে সবার আগে ওদের বাড়ির হোয়াইট ওয়াশ করা হয়েছিল। আসলে ২০০০ সালে হরভজনের বাবা হঠাৎ মারা গেলে গোটা পরিবারের পথে বসার উপক্রম হয়েছিল। আর ভাজি বা হরভজন কিছু বোঝার আগেই দেখল তার মা আর বোনদের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ওপর।

সেই দিশাহারা অবস্থার মধ্যে সে ডাক পেলো ভারতীয় দলে খেলার। ভারতীয় দলের অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি একরকম জোর করে তাকে দলে ঢোকালেন। প্রথম টেস্টেই সে বাজি মাত করে দিয়েছিল। এখন আর তাদের অভাব নেই। বোনদের ভালো বিয়ে দিয়েছে। বাড়ি সারিয়ে সুন্দর করেছে। মাকেও রেখেছে আরামে। সব কিছুই হয়েছে বা হচ্ছে খেলার দৌলতে।

এবার বলি ডিঙ্কো সিং-এর কথা। ১৯৯৬ সালের এশিয় ক্রীড়ায় (ব্যঙ্ককে) ডিঙ্কো মুষ্টিযুদ্ধে সোনার পদক পেয়েছিল। বাবার মৃত্যুর পর ডিঙ্কো তাদের তিন ভাই আর চার বোনকে চলে যেতে হয়েছিল এক অনাথ আশ্রমে। সাত ছেলেমেয়েকে অনাথ আশ্রমে পাঠানো ছাড়া ডিঙ্কোর মার আর কোনও উপায় ছিল না। ডিঙ্কোর দাদা শেষ পর্যন্ত অপুষ্টিতে মারা যায়। ছোটবেলা থেকেই ডিঙ্কো ছিল মাথা গরম, উগ্র স্বভাবের ছেলে। মনের মধ্যে জমে উঠেছিল ক্ষোভ। দারিদ্র্যের অভিশাপ ভুলে থাকার জন্যে বালির ব্যাগে জোরে জোরে ঘুষি লাগাত। তার মনের জোর ছিল অপরিসীম। তারই ওপর ভর রেখে ডিঙ্কো আজ ভারতের সোনা জয়ী বক্সার। আজ আর তার টাকার অভাব নেই। ইম্ফলে বাড়ি করেছে। সবার আগে মাকে এনে তুলেছে বাড়িতে। খেলাধূলাই ডিঙ্কোকে মুক্তি দিয়েছে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে।

জি এস সান্ধু এন আই এস পাতিয়ালার একজন সিনিয়ার কোচ। তাঁর পরিচিতি আজ শুধু এশিয়াতেই নয়, গোটা বিশ্বে। ভারতকে অনেক সম্মান এনে দিয়েছেন তিনি। সেই সুবাদে তিনি নেভির একজন অফিসার। কোচ হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট নাম। মনিপুর সরকার তাঁকে ভালো লোকালয়ে তিন ঘরের সুন্দর একটা বাড়ি দিয়েছে। খেলাধূলার জন্যেই যে তাঁর জীবনে সাচ্ছন্দ এসেছে সে কথা জোর গলায় বলতে পারবেন জি এস সান্ধু।

ভারতের সেরা অধিনায়ক?

এখন পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বেহালার বীরেন রায় রোডের চণ্ডী গাঙ্গুলির ছোট ছেলে সৌরভ ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক হতে চলেছে। সংখ্যা দু-তিন আগে লিখেছিলাম, মাত্র বছর দেড়েক আগে সৌরভকে দলনেতার পদ থেকে হটাতে যে রাজ সিং তৎপর হয়ে কলম্বোয় ছুটে গিয়েছিলেন সেই রাজ সিংহই এখন সৌরভের সঙ্গে হাত মেলাতে উদ্‌গ্রীব। রাজ সিং বোর্ডের প্রাক্তন সভাপতি মুথাইয়া শিবিরের প্রধান সেনাপতি। অর্থাৎ ঘোর ডালমিয়া বিরোধী। সৌরভ সেই জগমোহন ডালমিয়ার শহরের ছেলেই শুধু নয় জগুবাবুর অত্যন্ত স্নেহের পাত্রও। সেইজন্যেই নির্বাচকদের প্রভাবিত করে রাজ সিং চেষ্টা করেছিলেন সৌরভকে দলনেতার পদ থেকে হটাতে।

সেই রাজ সিং যখন সৌরভকে অভিনন্দন জানাতে এখানে ওখানে ছুটছেন তখন বোঝাই যায় অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি গোটা ক্রিকেট বিশ্বকে কতটা নাড়া দিয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন ও বর্তমান কিছু নির্বাচকও এখন স্বীকার করছেন এই বলে, যে খেলোয়াড়দের নিয়ে সৌরভের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ হতো সেই সব তরুণ খেলোয়াড় আজ ভারতের সম্পদ। কিছুদিন আগেও কেউ-কেউ ব্যঙ্গ করে তাদের সৌরভের ছেলে বলে উল্লেখ করতেন। আজ তাঁরাই তাদের প্রসঙ্গে বলেন 'সৌরভের ব্রিগেড'।

ভারতীয় দলের খেলোয়াড় তালিকার ওপর চোখ বোলালেই সৌরভ ব্রিগেড বলতে কাকে বোঝায় তা স্পষ্ট হয়ে যাবে। বীরেন্দ্র সহবাগ, সঞ্জয় বাঙ্গার, দীনেশ মঙ্গিয়া, মহম্মদ কায়িফ, যুবরাজ সিং, জাহির খান, হরভজন

একনাথ সোলকারের কথা মনে আছে? ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিল্ডারদের তালিকা বানাতে হলে একনাথের নাম গোড়ার দিকে রাখতেই হবে। সোলকারের বাবা ছিলেন পি জি হিন্দু জিমখানা ক্লাবের একজন মালি। মাঠের পরিবেশে বড় হয়ে উঠে সোলকার একদিন নিজেই ভারতীয় দলের খেলোয়াড় হয়ে গিয়েছিলেন। ক্রিকেট তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে। মুম্বাই এর ওরলিতে সোলকারের ফ্ল্যাট। সুনীল গাভাসকারও ওখানে থাকেন।

আলি শেরের বাবা দিল্লি গলফ ক্লাবের একজন ক্যাডি ছিলেন। তাই মাত্র ৮ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে ক্লাবে যেত আলি শের। সেখানে নাম করা গলফারদের খেলা দেখতে দেখতে শের আলিও একদিন চ্যাম্পিয়ন গলফার হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৯০ সালে আলি শের পেশাদার খেলোয়াড় হয়ে যায়। তারপর থেকে এ পর্যন্ত আলি ২৫ বার সারা বিশ্বের বিভিন্ন পেশাদার গলফ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আজ শের আলির বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ছেলে মেয়েরা ভালো স্কুলে পড়ে। খেলাধূলার দৌলতে আজ আর আলি শেরের কোনও অভাব নেই।

ফুটবল খেলোয়াড় আই এম বিজয়নের নাম সকলেরই জানা। বাবা মারা যাবার পর ওঁর মাকে লোকের বাড়ি কাজ করে বেড়াতে হতো। ১১ বছর বয়সে বিজয়ন তিন বছরের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়েছিল। তারপর থেকে আর তার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোনওদিন কষ্ট করতে হয়নি।

কলকাতার ছেলে খিদিরপুরের আলি কামার তাঁর বাবার মৃত্যুর পর পড়েছিলেন বড় কষ্টের মধ্যে। তার কারণ কামারদের বাড়িতে ওর বাবাই ছিলেন রোজগেরে মানুষ। ফলে গোটা পরিবার ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেখান থেকে এবছরই তাকে টেনে তুলেছে। কামার কমনওয়েলথ গেমস এ সোনা জিতেছিলেন। এখন আর তাদের অভাব নেই। অবশ্য খেলার জোরে আগেই সে রেলে চাকরি নিয়েছিল। ওয়াসিম জাফরের বাবা ছিলেন একজন ড্রাইভার। জাফররা অনেকগুলি ভাইবোন। তাই বড় কষ্টে তাদের দিন কাটত। বেঁচে থাকার জন্যে লড়তে হতো সবসময়। কিন্তু ২০০০ সালে জাফর ভারতীয় ক্রিকেট দলের হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে খেলেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়েছিল তার জীবনের মোড়। ভারতীয় দলে খেলার সুবাদে জাফর মোটা মাইনের চাকরি পেয়েছেন। ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশনের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজার সে।

বিনোদ কাম্বলির কথা তো সকলেরই জানা। ওঁরা পেশায় জেলে। কিন্তু ক্রিকেট খেলা বদলে দিয়েছে ওদের জীবন-ধারা। এইরকম অনেক খেলোয়াড় আছেন যাঁদের জীবনটাকে বদলে দিয়েছে খেলাধূলা। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, বাস্কেট, হকি, অ্যাথলেটিকস প্রভৃতির আসরে আজ সগৌরবে বিরাজ করছেন এমন অনেক খেলোয়াড় যাঁদের এক সময় বেঁচে থাকার জন্যে দারিদ্রের সঙ্গে লড়তে হয়েছে। কিন্তু খেলার মাঠের সাফল্য তাঁদের জীবনে এনে দিয়েছে সাফল্য, যশ, অর্থ ও প্রতিষ্ঠা। উদাহরণের সংখ্যা বাড়াতে গেলে এই তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠবে। তাই এবার অন্য প্রসঙ্গে আসি। অতি সাধারণ, দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছেন ভারতের অনেক কিংবদন্তী খেলোয়াড়। তাই বলতে বাধা নেই। দারিদ্রতা কোনও বাধা নয়। ঐকান্তিক ইচ্ছা, আন্তরিক চেষ্টা আর পরিশ্রম করতে পারলেই জীবনে সফল হওয়া যায়।

সিং, আশিস নেহরা। এরা প্রত্যেকেই ভারতীয় দলে ঢুকেছেন সৌরভের হাত ধরে। ওঁরা জানেন, ওদের জন্যে ক্যাপ্টেনকে কতটা লড়তে হয়েছে। ফলে সৌরভের সম্মান রাখার জন্যে ওঁরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। খেলেন প্রাণ দিয়ে। লড়েন সকলে এককাট্টা হয়ে। গোটা দলকে এইরকমভাবে এককাট্টা হয়ে খেলতে এর আগে কখনও দেখা যায় নি। ছোটদের উৎসাহ ও উদ্দীপনার ছোঁয়া লেগেছে শচীন তেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড় অনিল কুম্বলে কিংবা জাভাগল শ্রীনাথের গায়েও। ফলে তাঁরাও এগিয়ে এসে হাতে হাত মিলিয়েছেন। তাই কী টেস্ট ম্যাচ, কী একদিনের খেলা সব জায়গাতেই এগিয়ে যাচ্ছে সৌরভের ব্রিগেড। সৌরভের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের খেলা দেখতে দেখতে খুলে গেছে। ভারতীয় দলের খেলা দেখে বিদেশি সাংবাদিকদের অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ভারতও চমক লাগানোর ক্ষমতা রাখে। বিশ্বকাপের কালো ঘোড়া না বলে তাঁরা পরিষ্কার করে বলেছেন, ভারত যদি দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়নও হয় তাহলেও কিন্তু আমরা অবাক হব না। কারণ ভারতীয় ক্যাপ্টেনদের মধ্যে যে ঘাটতি ছিল তা সুদে আসলে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন সৌরভ।

আজহার উদ্দিন আর শচীন তেণ্ডুলকার যখন ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন তখন ভারতীয় দলের মানসিকতা ছিল—হারার আগেই হেরে বসে থাকার। সৌরভ কিন্তু তা পুরোপুরি কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন তরুণ খেলোয়াড়রা বলেন, শেষ বল পর্যন্ত লড়ে যাব। তাই তাঁরা লড়েছেন এবং দলকে দিয়েছেন নতুন চেহারা। তার ওপর ভর করেই ভারতীয় দলপতি গোটা ভারতকে আজ স্বপ্ন দেখিয়ে চলেছেন।

এইতো সেদিন ইংলন্ডের ভাষ্যকাররা গাল বাড়িয়ে চড় খেয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ইংলন্ডে এসে সৌরভের দল সুবিধে করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত কী হল? সৌরভ গাঙ্গুলির ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে রাবার জিতেছে। ২৪ বছর পরে ভারতের হাতে আবার রাবার ফিরে এসেছে। শুধু তাই নয় প্রথম দুটি টেস্টেই ভারত জয়ের মূলধন জোগাড়ে এনে ফেলে তারপর কলকাতায় ইডেন উদ্যানে তৃতীয় ও শেষ টেস্টে খেলতে নেমেছিল।

সৌরভের দলের খেলোয়াড়দের মনের জোর অসম্ভব বেশি। তাঁরা এককাট্টা হয়ে খেলেন। দুর্ধর্ষ সেনাপতির মতো সৌরভও এই মুহূর্তে বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার জন্যে তাঁর দল সাজিয়ে নিচ্ছেন। পুজোর সময় খবরের কাগজে একটা ছোট্ট খবর বেরিয়েছিল, বিশ্বকাপে ভারতকে রোখার জন্যে পিচ আবার নতুন করে বানানো হচ্ছে। ফাস্ট পিচ করে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের জব্দ করার জন্যে আই সি সি আর তাদের দোসররা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় এখন যে পিচ আছে তাতে ভারতীয়রা কেমন খেলবেন তার প্রমাণ গত সফরেই দিয়ে এসেছেন। তাই ওই পিচ চলবে না। এমন পিচ বানাতে হবে যে পিচ হবে অত্যন্ত ফাস্ট, যে পিচে থাকবে বাউন্স। তা না হলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের রানের পেছনে ছোটার গতি কোনওমতেই আটকানো যাবে না। তাই নতুন পিচ বানাও। এ নির্দেশ আই সি সির কিছু কর্তার।

সোনার মেয়ে

একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় খেলাধূলার জগতে ফুটবল বলতে বাংলা, টেনিস বলতে বাংলা, টেবল টেনিস বলতে বাংলা, সাঁতার বলতে বাংলা, বাস্কেটবল বলতে বাংলাকেই বোঝাতো। এমন কি ভারতীয় হকি দলে বাংলার দু চারজন খেলোয়াড় থাকতেনই। তারপর কী যে হয়ে গেল। বাংলা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ল। ফুটবলে খানিকটা থাকলেও আর কোনও বিভাগেই বাংলার সেই বোলবোলাও নেই। দু-একজন অবশ্য বাংলার ধ্বজা আজও উঁচু করে রাখার চেষ্টা করছেন। যেমন রীতা সেন, জ্যোতির্ময়ী শিকদার, লিয়েন্ডার পেজ, মান্তু ঘোষ, পৌলমী সিনহা, বুলা চৌধুরীদের মতো ক্রীড়াবিদ।

সময়টা যেন এখন একটু একটু করে বদলাচ্ছে। গত এশিয়াডে জ্যোতির্ময়ী শিকদার বাংলাকে সোনা এনে দিয়েছিলেন। বাংলার ছেলে লিয়েন্ডার পেজ শুধু ওলিম্পিক পদকই জেতেন নি, টেনিসের ডবলসে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন। তারপর এল এবারের কমনওয়েলথ গেমস। খিদিরপুরে এঁদো গলির ছেলে আলি কামার মুষ্টিযুদ্ধে সোনা জিতে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু সদ্য সমাপ্ত বুসান এশিয়াডে বাংলার দুটি মেয়ে গোটা ভারতকে চমকে দিয়ে সোনার মেডেল গলায় ঝুলিয়ে রাজ্যে ফিরে এসেছেন। বাংলার দুই সোনার মেয়ে হলেন সরস্বতী সাহা আর সোমা বিশ্বাস। সোনা ছাড়াও সোমা একটি রুপোর মেডেলও জিতেছেন। হেপটাথলনের মতো শক্ত বিভাগে সোমা এক চুলের জন্যে সোনার পদক পান নি। কলকাতায় ফিরে সোমা দুঃখ করে বলেছেন, আর একটু আত্মবিশ্বাসী হতে পারলে সোনার পদকটা আমারই হতো। তবে ৪ x ৪০০ মিটার রিলে দৌড়ে সোনা জিতে সোমা কিছুটা সান্ত্বনা পেয়েছেন।

সরস্বতী বেশ কিছুদিন ধরেই পিঠের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। বুসান এশিয়াডে তিনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন স্বল্প পাল্লার দৌড় ১০০ ও ২০০ মিটারে। দৌড়ের আগের দিনে ছিল ১০০ মিটার দৌড়। সরস্বতী একেবারেই সুবিধে করতে পারেন নি সেই বিভাগে। সপ্তম স্থান পেয়েছিলেন। তাই নিয়ে শুরু করেছিল সমালোচনার বন্যা।

কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা কাটতে-না-কাটতেই ঘুরে দাঁড়ালেন সরস্বতী। ২০০ মিটার দৌড়েও দুর্ভাগ্য কিন্তু তাঁর পিছু ছাড়ে নি। কিন্তু মনের জোরের কাছে হার মানতে হয়েছিল শারীরিক কষ্টকেও। ২০০ মিটার দৌড়ের শেষ বাঁকটা পার হবার সময়ই তিনি তাঁর পিঠের ব্যথার তীব্রতা অনুভব করলেন। পিঠে ছুরি লাগার মতো যন্ত্রণা সঙ্গে আড়ষ্টভাব। সেই প্রচণ্ড কষ্ট সরস্বতীকে ফেলে দিতে চাইছে। কিন্তু মনের জোরে সরস্বতী তখন ছুটছেন। সবার আগে তখনও তিনি। ওই তো দূরে সোনার পদকের হাতছানির সীমা রেখা। দাঁতে দাঁত চেপে

ছুটছেন সরস্বতী। ভয় এই বুঝি পাশ থেকে কেউ তাঁকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। আরও জোরে আরও জোরে...কিন্তু শরীর আর নিচ্ছে না। ওই তো লাল ফিতে। ওকে ছুঁতে হবে। হ্যাঁ, সবার আগে, গোটা শরীর সামনে ঠেলে দিয়ে সরস্বতী লাল ফিতের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে আনন্দে দু-হাত মাথার ওপর তুলে নেচে উঠলেন ছুটন্ত অবস্থাতেই। সোনা, সোনা জিতেছেন তিনি। তিনি আজ ভারতের সোনার মেয়ে, বাংলার গর্ব। পিঠের ব্যথা—সে তো আছেই। আনন্দের সেইমুহূর্তে পাততাড়ি গুটোতে হল সেই কষ্টকে।

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে তাঁর সমালোচনায় যাঁরা মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁরাই এখন তাঁর সাফল্যের কৃতিত্বে ভাগ বসাতে হামলিয়ে পড়লেন। অথচ একদিন আগেই তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন, ওর পক্ষে এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। সেভেন্থ হয়েছে এই যথেষ্ট!

সরস্বতী আর সোমা দুজনই বলেছেন, সরকারি সহায়তা ছাড়া তাঁদের পক্ষে আর বেশি দূর এগোন সম্ভব হবে বলে মনে হয়না। কারণ একটাই—খরচ। কতোটা? দুটো উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। প্রথমে সোমার কথাই ধরা যাক। ২০০০ সালের সিডনি ওলিম্পিক যোগ দেবার সাড়ে পাঁচমাস আগে সোমাকে কিটস আর খাবার জন্যে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। হেপটাথলনের সাতটি 'লেগের' জন্যে বুটের আলাদা আলাদা স্পাইক দরকার হয়। এক এক জোড়া স্পাইকের দাম পাঁচ হাজার টাকা। এই সব খরচ সামলে সোমাকে ওলিম্পিকে পাঠাতে তাঁর বাবাকে বাধ্য হতে হয়েছিল জমি বিক্রি করে দিতে।

এইরকম খরচের প্রসঙ্গে বাংলার আর এক সোনার মেয়ে জ্যোতির্ময়ী শিকদার বেশ একটা মজার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, হ্যাঁ—টাকা পাওয়া যায়, প্রচুর পাওয়া যায়—তবে তা পদক জেতার পর। কিন্তু জেতার আগে প্রয়োজনীয় টাকা পেলে বাংলার আরও অনেক মেয়ের গলায় সোনার পদক ঝুলতো।

ওসব, কথা থাক। সোমা আর সরস্বতী আজ শুধু ভারতের নয় বাংলারও গর্ব। কলকাতায় ফিরে ওঁরা দুজনই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, সম্বর্ধনা টম্বর্ধনা নয় আমাদের লক্ষ এখন এথেন্স ওলিম্পিক। সেই দিকে নজর রেখে আমরা তৈরি হতে চাই। তার জন্যে যে সহায়তার দরকার সেটুকু পেলেই আমরা খুশি হই।

বাংলাকে আরও একটি সোনা এনে দিয়েছেন লিয়েন্ডার পেজ। বুসান এশিয়াডে টেনিসের ডবলসে মহেশ ভূপতির সঙ্গে জুটি বেধে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেছে যে ওঁরা দুজনে (পেজ ভূপতি) একসঙ্গে জুটি বেঁধে খেলে ভারতকে আরও গর্ব করার মতো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। সেই সঙ্গে বাড়াতে পারেন ভারতীয় টেনিসের সুনাম। দিলীপ বোস, নরেশ কুমার, প্রেম জিৎ লাল, জয়দীপ মুখার্জি আর আখতার আলির পর লিয়েন্ডার পেজই তো বাংলার টেনিসের ধ্বজা তুলে ধরে রেখেছেন।

খিদিরপুরের ছেলে আলি কামার কমনওয়েলথ গেমসে সোনা জিতলেও সুবিধে করতে পারেননি বুসান এশিয়াডে। আলি নিজেকে আরও ভালোভাবে তৈরি করতে চান। তাঁরও লক্ষ এথেন্স ওলিম্পিক। কিন্তু সেই প্রস্তুতি পর্বে দরকার অনেক টাকার। তাঁর কোচ ও বেঙ্গল অ্যামেচার বক্সিং সংস্থা আর্থিক এবং মানসিক দিক দিয়ে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। এখনও করছেন। কিন্তু আরও যে অনেক টাকার দরকার।

সোমা, সরস্বতী, আলি কামারদের পাশে দাঁড়াবে কে? এইজন্যে শুধু রাজ্য সরকার নয়, কেন্দ্রীয় সরকারেরও এগিয়ে আসার দরকার। স্পনসররাও কি হাত গুটিয়ে থাকবেন? টাকার থলি নিয়ে শুধু ক্রিকেটারদের পেছনে না ছুটে তাঁরা যদি সোমা, সরস্বতী, আলি কামারদের দিকে একটু কৃপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন তাহলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে বাংলার ছেলেমেয়েরা। আর আমরা? আমরাই বা কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকব—আমরাও তো ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারি।

৪০০ ক্লাবের নতুন সদস্য

বিশ্বের অষ্টম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৪০০ ক্লাবের নতুন সদস্য হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফাস্ট বোলার গ্লেন ম্যাকগ্রাথ। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (শারজায়) তৃতীয় টেস্টে ম্যাকগ্রাথ প্রথম ইনিংসে ৪১ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে যান। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি আরও ৩টি উইকেট দখল করেন ১৮ রানের বিনিময়ে। নিচে ৪০০ উইকেট ক্লাবের সদস্যদের খতিয়ান দেওয়া হল ঃ

	টেস্ট	বল	রান	উইঃ	গড়
কোর্টনি ওয়ালশ (ওঃ ইন্ডিজ)	১৩২	৩০০১৯	১২৬৮৮	৫১৯	২৪.৪৪
শ্যেন ওয়ার্ন (অস্ট্রেলিয়া)	১০৪	২৯০২৯	১২২৭৭	৪৭৭	২৫.৭৩
কপিলদেব নিখাঞ্জ (ভারত)	১৩১	২৭৭৪০	১২৮৬৭	৪৩৪	২৯.৬৪
রিচার্ড হ্যাডলি (নিউজিল্যান্ড)	৮৬	২১৯১৮	৯৬১১	৪৩১	২২.২৯
মুরলিথরণ (শ্রীলঙ্কা)	৭৬	২৫৫৩৬	১০০৩০	৪৩০	২৩.৩২
ওয়াসিম আক্রাম (পাকিস্তান)	১০৪	২২৬২৭	৯৭৮৯	৪১৪	২৩.৬২
কার্টলে অ্যামব্রোজ (ওঃ ইন্ডিজ)	৯৮	২২১০৩	৮৪৯৮	৪০৫	২০.৯৮
গ্লেন ম্যাকগ্রাথ (অস্ট্রেলিয়া)	৮৭	২০৬০২	৮৬৯৩	৪০৬	২১.৬২

২০০২ সালের ২২ অক্টোবরে শেষ হওয়া অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত।

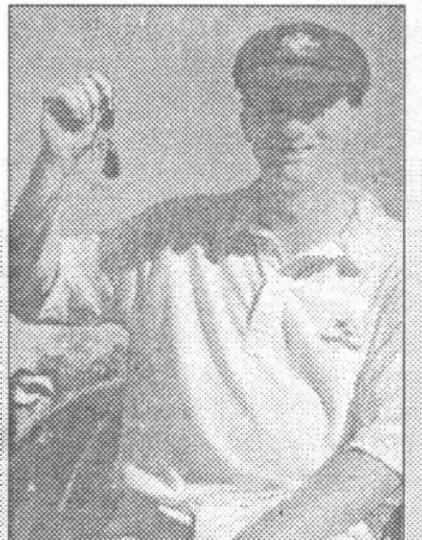

বইয়ের দুনিয়া

এ পার্বণে সে 'পার্বণী'

পুজোর মাত্র কয়েকদিন আগে যখন মেতে উঠেছে বাঙালির মন, বেজে উঠেছে 'আলোর বেণু', ঠিক তখনই আমাদের হাতে এসে পড়ল এক আশ্চর্য বই।

৮৪ বছর আগে প্রকাশিত বাংলায় প্রথম বার্ষিকী 'পার্বণী'। কোথা থেকে বেরিয়েছিল?

রবীন্দ্রনাথের ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথ বিদেশ থেকে ফিরে ভেবেছিলেন এই ধরনের সংকলনের কথা। সেদেশে যদি তাদের পার্বণ 'বড়দিন' উপলক্ষে ছোটদের জন্য সুন্দর-সুন্দর গল্প-নিবন্ধ-ছড়া সাজিয়ে বার্ষিকী বেরুতে পারে, বাংলায় নয় কেন?

তারপর?... সে তো ইতিহাস। ঠাকুরবাড়ির জ্যোতিষ্কদের আলোয় অত্যুজ্জ্বল, রায় পরিবারের সক্রিয় সহযোগিতায় এবং সেকালের সব স্মরণীয় শিল্পী-সাহিত্যিকের লেখনী ও তুলির স্পর্শে এক আশ্চর্য বার্ষিকী বেরুল ১৩২৫ সালে। কে নেই? একদিকে দ্বিজেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ, থেকে সুকুমার রায়, জগদানন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়... খেলায়-রেখায় বিহ্বল হয়ে যেতে হয়। ১৩২৬ সালে পার্বণী বেরোতে পারেনি। আবার বেরুল ১৩২৭ সালে।

তারপর... হারিয়েও গেল। শুধু বিস্মৃতির আড়ালে নয়। মূল বার্ষিকীদুটিকেও পাওয়া যায় না কোথাও।

একালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও সম্পাদক পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এত কাল পরে এক অসাধারণ আবিষ্কার করেছেন। একইসঙ্গে ১৩২৫ ও ১৩২৭ সালের দুইবছরের বার্ষিকী 'পার্বণী' প্রকাশিত হয়েছে নতুন চেহারায়। এই স্মৃতিমেদুর অনবদ্য প্রকাশনায় যেমন স্মরণীয় রঙিন আর্টপ্লেট ও ছবিগুলি রয়েছে, নতুন করে সাজানো হয়েছে আধুনিক ছবিতেও।

পার্বণী প্রত্যেক পড়ুয়া বাঙালির ঘরে রাখা উচিত।

পার্বণী। সম্পাদনা ঃ পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পত্র ভারতী। ৩/১, কলেজ রো, কলি ৯। ১০০ টাকা।

আনন্দ বর্ধন

কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী

বাংলা সাহিত্যে আকর্ষণীয় কিশোর অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লেখক দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি পাঠকের এক অন্তরঙ্গ প্রিয় লেখক। বাংলা অ্যাডভেঞ্চার সাহিত্যে যখন বিদেশি গোয়েন্দাকাহিনীর অদৃশ্য প্রভাব এসেছিল, সেই সময় দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন লেখনি ধরেন। আমাদের হাতে এসেছে, একটি বই ঃ দুঃসাহসী রঞ্জু, লেখক—দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আলোচন্য বইতে ছাপা হয়েছে তিনটি লেখা।

১। অপরাজেয়, ২। কিংমিক ও নানুকের দেশে, ৩। দগ্ধনিঃসীম মহামরুপথে।

প্রথম-উপন্যাস ঃ অপরাজেয়। এই উপন্যাসে আছে, রঞ্জুর জীবনের লড়াই, তার নিঃশব্দে নিরুদ্দেশ হয়ে সমুদ্রে তিমি শিকার অভিযান।

দ্বিতীয় উপন্যাস ঃ কিংমিক ও নানুকের দেশে। এস্কিমোদের দেশ পৃথিবীর সর্বোত্তর প্রান্ত-উত্তর মেরু। এস্কিমো ভাষায় 'কিংমিক' হলো সর্বক্ষণের সাথী কুকুরবাহিনী। অ্যাডভেঞ্চার ও মানবতা এ কাহিনীতে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

তৃতীয় কাহিনী—'দগ্ধনিঃসীম মহামরুপথে'। সাহারা মরুভূমির কাহিনী। এ কাহিনীতে আছে মরুভূমির বাসিন্দাদের জীবনযাপনের বহু কথা। তিনটি কাহিনীই অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

আলোচ্য বইটি দেখে পড়ার আকাঙ্ক্ষা বাড়ে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পরে পাঠকের মন কাড়ার দাবি রাখে। এই বইটির ঝকঝকে মুদ্রণ, শুধু কিশোর নয়, সর্বস্তরের পাঠকদেরই আকর্ষণ করবে আশা করা যায়।

দুঃসাহসী রঞ্জু। দীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। পত্র ভারতী। ৫০ টাকা।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

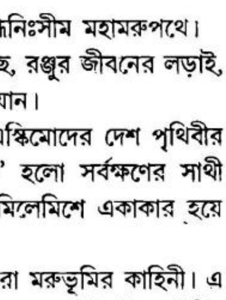

ছোটদের মনের মধ্যে বিজ্ঞানকে প্রবেশ করানো সর্বদাই কঠিন। এই কঠিন কাজটিকে সহজ করে দেখিয়েছেন লেখক শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় যেমন—দি গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের বর্ণনা। "ওদের ঘুম", "পালাও পালাও" এবং "সমুদ্র-শান্তি জানে না" লেখাগুলি মনোগ্রাহী। পিঁপড়ে, উইপোকা, গুবরে পোকা ও শিল্পী পাখির কথা বড়দেরও ভালো লাগবে। খুনে তিমির বর্ণনা একটা চমক। বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী পান্ডা সম্বন্ধে আলোচনা বইটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। সংক্ষিপ্তভাবে সমুদ্র সম্পর্কে যে ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে তা এক কথায় চমৎকার। "পুরোপুরি অন্ধকারে প্যাঁচারা আমাদের মতই অন্ধ" কিংবা 'বহুরূপী ইচ্ছামত রঙ বদলাতে পারে না" এরকম প্রচলিত ধারণা ভাঙে এই বই পড়লে। এসবের মধ্যেও লেখক কিন্তু জানাতে ভোলেননি "মানুষ ছাড়া আর নিষ্ঠুর কেউ নেই"। লেখকের বর্ণনার ভাষা ও প্রয়োগকৌশলের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার মিশেল বইটিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে। সবই হয়েছে তবে বইটিতে কিছু আকর্ষণীয় ছবি থাকলে ভাল লাগত। একই ছবি বারবার দেখাটাও অপছন্দের। প্রচ্ছদটি সম্পর্কে আর একটু যত্নবান হওয়া যেত।

জীবজগতের আজব কথা। ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স। ৪৫ টাকা।

ডঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

এবার বয়স্কদের জন্যেও!

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-অপ্রেমের ৫ উপন্যাস

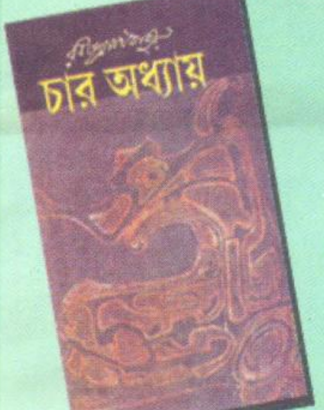

চার অধ্যায় ১৫.০০
শেষের কবিতা ২৫.০০
ঘরে বাইরে ৪০.০০
মালঞ্চ ১৫.০০
চতুরঙ্গ ১৫.০০

স্মরণীয় গল্প সংকলন
বঙ্গবাণী গল্পসম্ভার ১০০.০০

অনাবিল হাসির
নারীঘটিত ৪০.০০
শ্যামল দত্তচৌধুরী

জীবনানন্দ বিষয়ক
হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর ৩০.০০
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

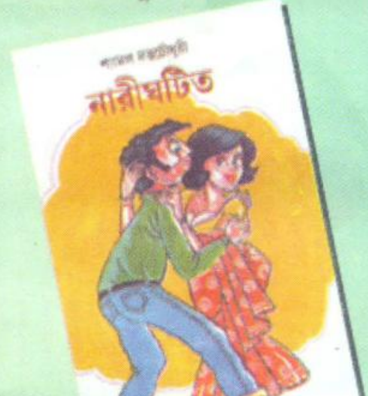

১০০ বছর আগের
সাড়া জাগানো বই
মায়াবী ৫০.০০
পাঁচকড়ি দে

টান টান থ্রিলার
মার্ডার ডট কম ৪০.০০
অনীশ দেব

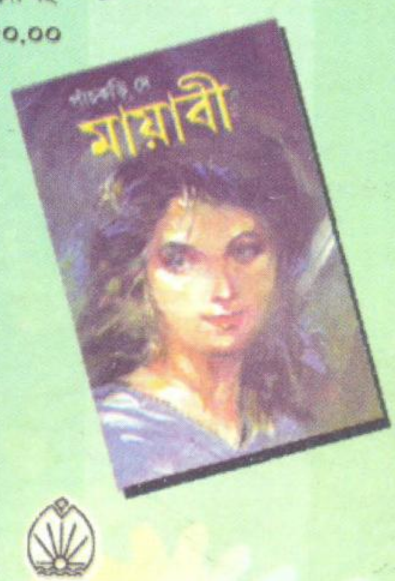

ব্যর্থপ্রেমিকের তিন
মহাদেশ অভিযানের
সত্য জীবন-উপন্যাস
গঙ্গা থেকে নায়াগ্রা ৬০.০০
দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী

পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯
ফোন ২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ৩৫৪ ০৪৬২
e-mail : patrabha@vsnl.net

Postal Regn. No. WB/RNP 24? N. P. Regn. No 16599/68 NOVEMBER 2002 Rs. 10.00